[রোমাঞ্চকর শিশু-উপন্যাস]

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

পুনর্মুদ্রণ
বৈশাখ, ১৩৪৪

রোমাঞ্চকর গল্প লিখতে হলে অনেক অসম্ভব ব্যাপারের অবতারণা করতে হয়। ঘটনা যত অস্বাভাবিক ও অভাবনীয় হবে, গল্পের রসও জমবে তত জমাট্ ভাবে। কাজে কাজেই 'মরণের ডাক' বইখানিকে রোমাঞ্চকর করে' তুলতে আমারও উদ্ভট কল্পনার সাহায্য নিতে হয়েছে। তবে, বইখানির মধ্যে যে সব ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক তথ্য আছে,—তা কিন্তু মিথ্যা বা মন-গড়া নয়।

আর একটা কথা এখানে বলে রাখি,—'মরণের ডাক' বইখানি কোনো বিদেশী বইয়ের অনুবাদ তো নয়-ই ;—ছায়া অবলম্বনেও লিখি নাই। এটা আমার সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু
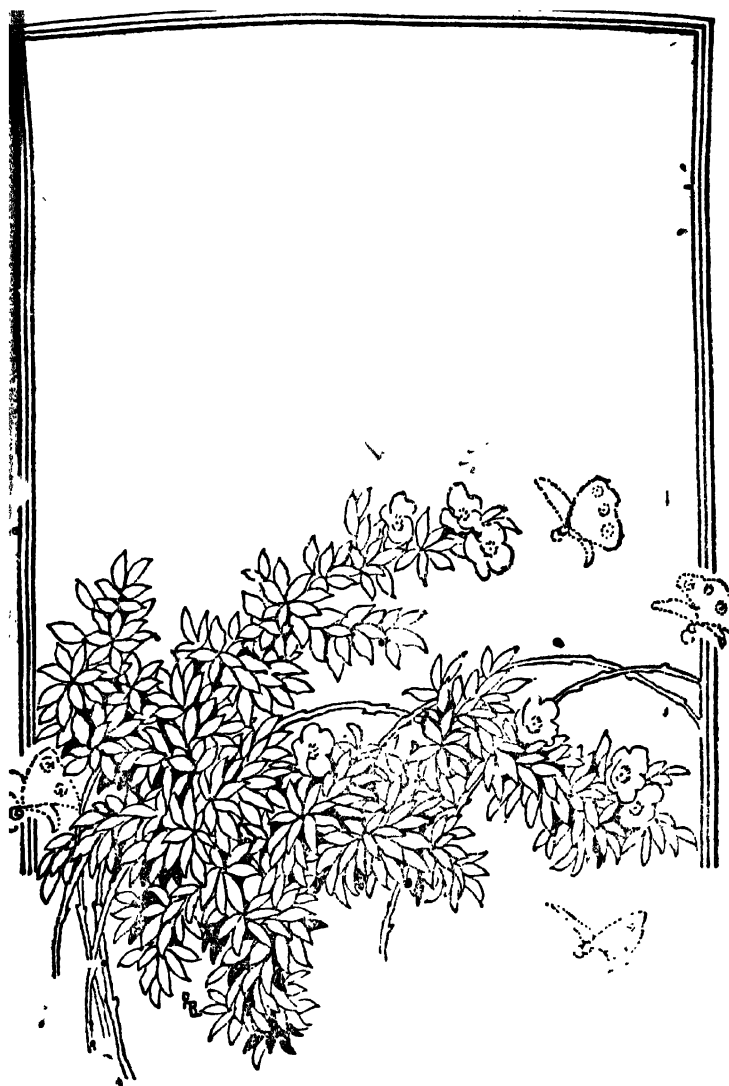
মরণের ডাক

ক্ষুদে মানুষগুলি আমাদের দেখতে পেয়ে আমাদের দিকে ছুটে এলো

—৩৭ পৃষ্ঠা

এক

আরম্ভ

ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্.........

শীতের ঘন কুয়াসা ভেদ করে' অতি ধীরে ধীরে আমাদের জাহাজখানি চীন-সাগর পাড়ি দিচ্ছে।

কয়েক ঘণ্টা হোলো সিঙ্গাপুর বন্দর ছাড়িয়েছি। এতক্ষণ আমরা খালি দক্ষিণ দিকে এসেছি, এবার আমাদের জাহাজ ঘুরে চলেছে উত্তর-মুখো, জাপানের দিকে।

যাহাজের যাত্রীদের মধ্যে বাঙ্গালী মাত্র দুইজন—আমি আর বাহাদুর। আর যে সব যাত্রী আছে—তাদের বেশীর ভাগই চীনে আর জাপানী।

বাহাদুরের মামা জয়ন্তবাবু জাপানের কোবে সহরে অনেকদিন থেকেই সপরিবারে স্থায়ীভাবে বাস করছেন।

বছর তিনেক আগে কাঁচের কাজ শিখতে বাহাদুর প্রথম তাঁদের ওখানে গিয়ে ওঠে।

সম্প্রতি সে ছুটি নিয়ে দেশে ফিরেছিল, আবার ফিরে জাপানে চলেছে।

আমার কাকার রেশমের কারবার।

উন্নত প্রণালীতে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে আজকাল কি ভাবে

জাপানে রেশম তৈরি হচ্ছে, হাতে কলমে তা' শিখবার জন্যে কাকা আমাকে জাপানে পাঠাচ্ছেন।

বাহাদুর আমার সমবয়েসী ; প্রথম আলাপ এই 'তোয়াং-মারু' জাহাজে—কল্‌কাতার আউটরাম ঘাটে।

সুদূর বিদেশের যাত্রী আমি, অজানা আশঙ্কায় বুক যখন দুরু দুরু, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় যখন প্রাণ ভারাতুর, প্রিয়জনদের বিচ্ছেদ ব্যথায় যখন মন ভরপুর, তখন হঠাৎ দেখা ডেকের উপর বাহাদুরের সঙ্গে।

লম্বা একহারা চেহারা, টিকালো নাক, চোখ দুটো অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল, যেন বুদ্ধি ঠিকরে পড়ছে।

ডেকের রেলিং ধরে' সে দাঁড়িয়েছিল অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে। প্রথম দর্শনেই তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

আলাপের সঙ্গে সঙ্গেই আমার মন থেকে সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, ব্যথা-বেদনা যেন কোন্ যাদুমন্ত্র বলে শূন্যে মিলিয়ে গেল। নবীন উৎসাহে, নূতন উদ্যমে প্রাণ যেন মেতে উঠল। মনে হোলো বাহাদুরের সঙ্গে আমার যেন যুগ-যুগান্তরের পরিচয়, জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়তা।

আজ কয়েকদিন জাহাজে আমাদের এক সঙ্গে কাটছে, এখন পর্য্যন্ত কোনো অভাব বোধ করছিনা ; সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে তারও কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে এই বাহাদুরকে যদি সঙ্গীরূপে পাই তবে বোধ হয়

অনন্তকাল ধরেও আমি অনায়াসে অসীম সমুদ্র পাড়ি দিতে পারি—একটুও কষ্ট হয় না।

আর একটা মস্ত সুবিধার কথা।

বাহাদুর জাপানে তিন বছর কাটিয়েছে, জাপানী ভাষাও সে কিছু কিছু বলতে পারে। কাজেই সম্পূর্ণ নূতন দেশ হলেও আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা সেখানে হবে না।

বাহাদুরের পুরো নামটা আর বলব না, ডাক নাম বাহাদুর ; আমারো ডাক নামেই আমি এবার থেকে পরিচিত হব। শঙ্কর আমার ডাক নাম।

দুই
ভূমিকম্প নয়

গভীর রাত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কেবিনে আমি আর বাহাদুর ঘুমে অচেতন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম বালীগঞ্জের বাড়ীতেই যেন শুয়ে আছি আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে; হঠাৎ প্রবল এক ঝাকুনি খেয়ে চমকে জেগে উঠলাম, ভাবলাম উত্তর-বিহার কিম্বা কোয়েটার মতই বুঝি বালীগঞ্জে ভূমিকম্প আরম্ভ হয়েছে।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম, ঘুমের ঘোরটা একটু কাটতেই বুঝতে পারলাম, বালীগঞ্জের বাড়ীতে সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করলেও স্থূল শরীরে আমি বর্ত্তমানে আছি 'তোয়াং মারু' জাহাজে—দুস্তর চীন সাগরের মাঝে।

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমাদের জাহাজখানা যেন নিশ্চল হয়ে থেমে গেছে। জাহাজের তো এখন থামবার কথা নয়, একেবারে হংকং বন্দরে গিয়ে নোঙর করবে।

আর যদি কোন বন্দরেই থামবে তবে এভাবে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে জাহাজ থামতে যাবে কেন? নিশ্চয়ই কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে। একটা অজানা ভয়ে আমার বুকটা শিরশির করে উঠল।

পাশেই বাহাদুরের বিছানা। তাড়াতাড়ি 'সুইচ্' টিপে আলো জ্বালিয়ে দেখি বিছানায় বাহাদুর নেই! সর্ব্বনাশ!!...

আর বিন্দুমাত্র কাল বিলম্ব না করে' আমি একলাফে কেবিনের বাইরে চলে এলাম—ভয়ে, আতঙ্কে, উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীরটা থর্ থর্ করে' কাঁপছিল।

বাইরে এসে দেখি জাহাজের প্রায় সব যাত্রীরাই জেগে উঠেছে, সকলের চোখে মুখেই যেন একটা আতঙ্কের ছায়া।

সামনে যাকে পাই তাকেই আকুল হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু কেউ-ই ঠিক মত কিছুই বলতে পারে না। দুই একজন চীনে খালাসীকেও এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম, তারাও 'হং চং' করে কি উত্তর দিল মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

এমন সময়ে বাহাদুর এসে হাজির! আমার হাত ধরে বললে "খুব ভয় পেয়েছ, না?"—আমি কাঁপা গলায়, চাপা স্বরে বল্লাম—"কি ব্যাপার বাহাদুর?"

"আমাদের কামরায় চল শঙ্কর, সমস্ত ঘটনাটা খুলে বল্ছি।"

—"তুমি এত রাত্রে বিছানা ছেড়ে গেছিলে কোথায়?"

—"ব্যাপারটা জান্তে জাহাজের কাপ্তানের কাছে গেছিলাম, প্রথম ঝাঁকানি খেয়েই আমার ঘুম ভেঙে গেছিল?"

—"প্রথম ঝাঁকানি?"

—"হাঁ শঙ্কর, তিনবার প্রচণ্ড ঝাঁকানির চোটে সমস্ত

জাহাজখানা ভয়ঙ্কর ভাবে কেঁপে ওঠে, তুমি শেষবার টের পেয়েছ।”

আমরা কামরায় এসে পৌঁছলাম। শীতের অফুরন্ত দুরন্ত বাতাসে কামরার দরজাটা প্রবলভাবে আন্দোলিত হচ্ছিল।

দরজাটা ভালো করে আট্‌কে দিয়ে বাহাদুর বল্লে—“কাপ্তেনও ভালো করে' কিছু বলতে পারলেন না—তবে অনুমান করছেন কোনো জিনিষের সঙ্গে জাহাজটা প্রায় ধাক্কা খেয়েছিল আর কি! একটুর জন্যে বেঁচে গেছে।—”

—“তার মানে? ধাক্কা খায়নি?”

—“আরে, ধাক্কা খেলে কি আর এখনো তুমি আমি এই রকম জাহাজের কামরায় বসে দিব্বি খোশ্‌গল্প করছি—এতক্ষণ তাহলে......”

বাহাদুরের কথায় বাধা দিয়ে বল্লাম “তুমি যে ব্যাপারটাকে ক্রমে আরো জটিল ক'রে তুলছ,—দোহাই বাহাদুর,—হেঁয়ালী করে' আর কথার জট পাকিও না,—কাপ্তেন কি বল্লেন তাই বল,—আমার বুকটা এখনো দুর্ দুর্ করেছে।”

—একটু মুচ্‌কী হেসে বাহাদুর বল্লে—“কাপ্তেন যে কিছুই বল্‌তে পারলেন না, তাই তোমারও কৌতূহল আমি দূর করতে পারছি না। তবে আজ্‌কে রাতের মত নিশ্চিন্ত,—জাহাজের কল্ বিগড়ে গেছে। মেরামত না হওয়া পর্য্যন্ত জাহাজ আর

নড়বে না। কাজেই আপাততঃ নির্ভাবনায় বাকী রাতটুকু ঘুমিয়ে কাটানো যাক্।”

পরম নিশ্চিন্ত ভাবে এই কথাগুলি বাহাদুর বল্লে। তার চোখে মুখে একটুও ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম না।

আমি বল্লাম, “তুমি কথাগুলি অতি সহজ ভাবে বলছ,—কিন্তু সহজ ভাবে আমি তোমার কথার অর্থ বুঝ্‌তে পারছি না। জাহাজ এখানে নোঙর করল কোথায় ?”

—“ছোট্ট একটী দ্বীপে। কাপ্তেনের কাছে জান্‌লাম—কাল সারাদিনটা জাহাজ মেরামত করতে’ কেটে যাবে। কালকে রাত্রির আগে আর জাহাজ ছাড়বার কোনোই সম্ভাবনা নাই।”

তিন
ঘটনার তদ্বির

ভোরে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাশের বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে বাহাদুর বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছে।

কাল রাত্রের ঘটনাটা আমার মস্তিষ্কের অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসে আছে, তাই রাত্রের শেষ দিকটায় আমার আর ভালো ঘুম হয় নাই।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম, 'কেবিনের' বাইরে এসে দেখি কুয়াসার ঝাপসা পর্দ্দার ভিতর দিয়ে নিস্প্রভ সূর্য্যদেব উঁকি মারছেন। চাঁদ কি সূর্য্য চট্ করে' ধরা কঠিন।

কাপ্তেনের সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি দেখা। জাপানী—কিন্তু ইংরাজী ভাষায় বেশ দখল আছে।

কাপ্তেনকে দেখে আমি হাত তুলে অভিবাদন করলাম, তিনিও তার প্রত্যুত্তর দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছেন?" সহাস্যে উত্তর দিলাম "আছি তো ভালই, কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো? কাল রাত্রে কি কোনো চড়ায় কিম্বা কোনো গুপ্ত পাহাড়ের সঙ্গে জাহাজ ধাক্কা খেয়েছে?"

—"অসম্ভব, এ রাস্তা দিয়ে আজ প্রায় কুড়ি বছর যাতায়াত করছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ রকম ঘটনা ঘটে নাই।"

—"তবে জাহাজ এ রকম মারাত্মক রকম কেঁপেই বা উঠ্‌ল কেন, আর কলই বা বিগড়ে গেল কেন ?"

—"সেটাই তো বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। এখানে চীন সাগর অতি গভীর, কোন লুকানো পাহাড়ে কিম্বা চড়ায় জাহাজ ঠেক্‌বার কোনো কারণ নাই।"

—"তবে কি কোনো ভাসমান বরফের চাঁইএর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে ?"

—"না, তা হলে আমাদের জাহাজের অবস্থা হোতো 'টাইটেনিক' জাহাজের মত, জাহাজ আমরা বাঁচাতে পারতাম না। কোনো জিনিষের সঙ্গে আমাদের জাহাজ ঠোক্কর খায় নি, জাহাজের নীচু দিক থেকে তিন তিনবার কে যেন জাহাজকে উল্‌টে ফেলতে চেষ্টা করেছিল !"

কাপ্তেনের কথা শুনে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। বল্লাম "তবে কি আপনি বলতে চান তিমি মাছের কাণ্ড এটা ?"

—"আমিও তো সে কথা ভেবেই পাচ্ছি না। এত বড় জাহাজকে তিমি মাছ যে কাবু করতে পারে—এ ধারণা আমার ছিল না, এখনো নেই।"

—"তবে আপনি বলতে চান, তিমির চেয়েও আরো ভয়ঙ্কর কোনো সামুদ্রিক জীব চীন সাগরে আছে !"

—কাপ্তেন বল্লেন—"এখন তো আমার তাই মনে হচ্ছে।"

কাপ্তেনের কথা শুনে আমার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বেরুলো না।

আমার মুখে ভয়ের ভাব লক্ষ্য করে কাপ্তেন সহাস্যে বল্লেন "ভয় নেই, যত ভয়ঙ্কর রাক্ষুসে জীবই হোক না কেন, আমাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। জাহাজের সামান্য একটু ক্ষতি হয়েছে মাত্র, তার চেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে নিশ্চয়ই সেই জন্তুটার। জাহাজের ধাক্কায় ওর বোধ হয় হাড়-গোড় গুঁড়িয়ে গেছে।"

যাক্, তবু একটু আশ্বস্ত হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম "আচ্ছা কাপ্তেন, আমরা এখন কোথায়? এ কোন্ দ্বীপে জাহাজ নোঙ্গর করেছেন?"

"এ দ্বীপটির সঙ্গে আমারও বিশেষ পরিচয় নেই, তবে চীন সাগর পাড়ি দেবার সময় অনেক ছোটখাট দ্বীপ নজরে পড়ে। সেই রকমই একটা দ্বীপ এটা। জাহাজ মেরামত করতে হবে বলে এই দ্বীপে আপাততঃ জাহাজ লাগানো গেছে! আমরা এখন ঠিক বোর্ণিও ও কোচিন-চায়নার মাঝামাঝি জায়গায়।"

—"জাহাজ সারতে কতক্ষণ লাগ্‌বে মনে করেন?"

—"মেরামতের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, আমার মনে হয় সন্ধ্যার পরই আমরা জাহাজ ছাড়তে পারব!"

কাপ্তান বিদায় নিলেন, আমি আবার কামরায় ফিরে এলাম। বাহাদুর তখনো ঘুমোচ্ছে।

ঠেলা মেরে বাহাদুরকে তুলে দিলাম। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে সে জিজ্ঞাসা করলে, "এ্যাঁ, ভোর হয়েছে?"

বেলা তখন প্রায় সাড়ে নয়টা। ঝলমলে শীতের রোদ 'পোর্টহোলের' মধ্যে দিয়ে আমাদের ঘরের মধ্যে এসে পড়ছিল।

"ঈস্ এত বেলা হয়ে গেছে, আমায় জাগাও নি?"

আমি উত্তর দিলাম "ঘুমন্ত লোককে অনর্থক জাগাতে আমি ভালোবাসি না, আমাকেও কেউ অসময়ে জাগায় এটাও আমি পছন্দ করিনা!"

—"আচ্ছা মনে রইল, আবার যদি আজ রাত্রে (ভগবান না করুন) কোনও ব্যাপার ঘটে তা হলে আর তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করব না কক্ষনো।"

চার
মাটির টান

কুয়াশা কেটে গেছে। শীতের প্রশান্ত সূর্য্যের প্রদীপ্ত আলো ডেকের উপর এসে পড়েছে। এই দিকেই যাত্রীদের জটলা বেশী! সবাই রোদটাকে পুরোপুরি ভাবে উপভোগ করতে চায়!

উপরে নির্মেঘ নীল আকাশ, নীচে নিস্তরঙ্গ নীল জল থৈ থৈ করছে।

সামনের দুটি ডেক্ চেয়ারে বসে আমি আর বাহাদুর। কাঠের মেঝেতে একটি মাদুর পেতে বসে একজন আরবদেশীয় লোক গলা ছেড়ে গান গাইছে—

—"ওয়াযাদ্‌তা আবাকা তাবে আম্ ফা
তাবে-ভান্তু,
ওয়াআন্‌তা লে উহ্‌হারের
রে যালে লাজুম।"

গানের অর্থ বুঝ্‌তে না পারলেও লাগছিল বেশ ভালোই।

সামনের উদার আকাশের দিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে বাহাদুর আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা শঙ্কর, বল্‌তো জাপানের আসল নামটা কি?"

—উত্তর দিলাম "তোমার সব কথাতেই হেঁয়ালী, জাপানের আবার আসল নাম কি ?"

"ওঃ, তুমি জানোনা, তবে শোনো। জাপানে যাচ্ছ এটা জেনে রাখা ভালো। জাপানের আদৎ নাম হচ্ছে 'নিপ্পন' বা 'নিহোন'! 'নিতি পন্' মিলে হয়েছে নিপ্পন। 'নিতি' মানে সূর্য্য আর 'পন্' হচ্ছে উৎপত্তি স্থান। অর্থাৎ ঐ দিক থেকে সূর্য্য ওঠে বলে ওর নাম হচ্ছে নিপ্পন। এই নিপ্পন শব্দটার চীনা উচ্চারণ হচ্ছে 'জু-পেন্।' তারপর 'জুপেন' ইয়োরোপীয় উচ্চারণে হয়েছে জাপান।"

সত্যিই এ সম্বন্ধে আমার কোনোই জ্ঞান ছিল না।

জাপানকে চিরকাল জাপান বলেই জান্তাম, তার নামের ভিতর যে আবার এত মারপ্যাঁচ আছে কে জান্তো ?

আমরা এই রকম গল্প গুজোব করছি এমন সময় মনে হোলো জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে বেশ একটা হুল্লোড় লেগে গেছে, সবাই মিলে যেন হুড়াহুড়ি হুটোপাটি লাগিয়ে দিয়েছে।

এ আবার কি ? বাহাদুর বল্লে "বোসো শঙ্কর, আমি ব্যাপারটা জেনে আসি, যাত্রীদের মধ্যে ভারী যে উল্লাসের ধুম পড়ে গেছে।"

আমিও আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে বাহাদুরের পিছনে পিছনে চল্লাম।

ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। কাপ্তান হুকুম দিয়েছেন যাত্রীরা ইচ্ছা করলে দ্বীপে নেমে বেড়িয়ে আস্তে পারে কিছুক্ষণের জন্যে। তাই আরোহীদের মধ্যে এত উৎসাহ উল্লাসের সাড়া পড়ে গেছে।

ছোট ছোট বোট্গুলি খুলে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে—আর তাতে বোঝাই হয়ে দ্বীপে গিয়ে উঠছে উৎসাহী যাত্রীর দল।

বাহাদুর বল্লে, "যাবে নাকি শঙ্কর, চলনা অজানা দ্বীপটায় একটু ঘুরে আসা যাক্, চুপ্ চাপ্ জাহাজে বসে থাক্তে আর ভালো লাগছে না।"

এক কথাতেই আমি রাজী। দেশ ছাড়ার পর এতদিন আর মাটিতে পা পড়ে নাই। পেনাং আর সিঙ্গাপুর বন্দরে যখন জাহাজ ভিড়েছিল তখন গভীর রাত, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার জাহাজ ছেড়ে যায়। কাজেই মাটিতে নামবার আর সুযোগ হয়ে ওঠে নাই।

যে-মাটির সঙ্গে আজন্মের সম্বন্ধ এখন যেন নেহাৎ অকৃতজ্ঞের মতই তার সম্পর্ক ত্যাগ করেছি।

বল্লাম—"চল্ বাহাদুর, দ্বীপটায় নেমে খুব এক চোট দৌড়াদৌড়ি করি, ছেলে-মানুষের মত ধূলোয় লুটোপুটি খাই। আমরা যে অকৃতজ্ঞ নই মাটি-মাকে সে কথা জানিয়ে দেই, তাকে যে চিরকাল ভালোবাসি, তার চরণ ধূলো মাথায় নিতে,

গায়ে মাখতে আমাদের যে কত আনন্দ তা একবার দেখিয়ে দিয়ে আসি।”

আমার কথা শুনে বাহাদুর মৃদু হেসে গান ধরলে—

“আমার সোনার বাংলা, তোমায় ভালবাসি—
চিরদিন তোমার আকাশ
তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।”—

হো হো করে’ হেসে উঠে আমি বল্লাম “সে কি হে বাহাদুর, এই ‘চং ফং’ এর দেশে তুমি যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলে ?”

গান থামিয়ে বাহাদুর বল্লে, “এই সামান্য কথাটা আর বুঝতে পারনা শঙ্কর! ভাবরাজ্য আর বাস্তব রাজ্য দুটির মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি। বাস্তব রাজ্যে হয়ত কোনো ভাবুক বা কবি গ্রীষ্মকালের দুপুরে সাহারার মরুভূমি দিয়ে উটের পিঠে ‘লু’ বাতাসের ঝাপটা খেতে খেতে চলেছে, আর ভাব রাজ্যে সে হয়ত তখন বাসন্তী-পূর্ণিমার রাত্রে স্নিগ্ধ চাঁদের আলোয় কাশ্মীরের ‘ডাল’ হ্রদের তীরে দ্রাক্ষা কুঞ্জের পাশে ধীর সমীর সেবন করছে।”

—“আরে বাহাদুর তুমি যে মস্ত এক কবি দেখতে পাচ্ছি।”

—“কবি নই ভাই, তবে জীবনের প্রথম দিকটায় কবিরাজী

শিখ্‌তে আরম্ভ করেছিলাম বটে। এখন চল একবার নবদ্বীপ বেড়িয়ে আসা যাক্।"

"তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, না হলে এই অচিন্ চীন সাগরে ভাস্‌তে ভাস্‌তে 'সোনার বাংলা' 'নবদ্বীপের' কল্পনা তোমার মগজে গজিয়ে ওঠে? নবদ্বীপ এখানে পেলে কোথায়! বরং জাভার কাছাকাছি বলে যব-দ্বীপ বল্‌তে পার।"

"আরে দুৎ, আমার কথার অর্থই তুমি ধরতে পার নাই, নবদ্বীপ মানে সেই শান্তিপুর, নবদ্বীপ, নয়,—নতুন দ্বীপ, নতুন দ্বীপ।"

জাহাজের কাপ্তান এমন সময়ে আমাদের কাছে এসে হাজীর! আমরাও দ্বীপ দেখতে যাচ্ছি শুনে তিনি বল্লেন, "অজানা জায়গা, বেশী দূরে কোথাও যাবেন না, তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরবেন, জাহাজের কল কব্জা বিশেষ কিছুই খারাপ হয় নাই, বোধ করি সন্ধ্যার মধ্যেই জাহাজ ছাড়তে পারব।"

পাঁচ

অজানা দ্বীপে

আঃ কি আরাম !

আজ অনেকদিন পর মাটিতে পা পড়তে সমস্ত মনে-প্রাণে যেন একটা অপূর্ব্ব পুলক শিহরণ জেগে উঠল।

যে সব যাত্রী এসে দ্বীপে নেবেছে, তাদেরও উৎসাহের সীমা নাই। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পায়চারী করতে করতে গান জুড়ে দিয়েছে, কেউ বা ছুটোছুটি করছে আবার কোন কোন লোক বালুর চরায় গা এলিয়ে দিয়ে শীতের রোদ উপভোগ করছে।

তীরের দিকেই সাগরের চঞ্চলতাটা বেশী,—সফেন জলরাশি সগর্জ্জনে বালুর চরায় এসে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে পড়ছে,—আমাদের ছোট ছোট বোট্‌গুলি ঢেউয়ের তালে তালে উঠ্‌ছে নামছে। তার ওধারে—কিছু দূরে সাগরের সমাহিত অবস্থা, সেখানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের নোঙর বাঁধা জাহাজ !

বালুর চরা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ঢালু হয়ে এসে মিশেছে মখ্‌মলের মত তৃণাচ্ছন্ন সবুজ প্রান্তর।

গাছপালার মধ্যে বেশীর ভাগই নারকেল আর সুপারি

কিন্তু গাছগুলি আকারে যেন একটু ছোট ছোট মনে হোলো, ঠিক বাংলা দেশের গাছের মত অত দীর্ঘ নয়।

বাহাদুরকে বল্লাম—"চল বাহাদুর, দ্বীপের ভিতরটা একটু দেখে আসা যাক্, জায়গাটা ভারী চমৎকার বলেই মনে হচ্ছে—"

বাহাদুর বল্লে, "আরে, যখন ডাঙ্গায় এসে নেমেছি তখন কি আর একটু না বেড়িয়েই জাহাজে ফিরব। ঐ যাত্রীগুলির উৎসাহের বহর দেখে আমার হাসি পাচ্ছে, বালুর চরায় ঐ রকম ঘোরাঘুরি না করে' জাহাজের ডেকের উপর ঘুরপাক খেলেই পারত।"

বালুর চরা পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা উঁচু জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। সামনে তাকাতেই দেখি মস্ত একটা ঝিল নদীর মত একেবেঁকে কোথায় জানি চলে গেছে। ঝিলটি কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ। ধারে ধারে এন্তার গাছপালা, আর সেই সব গাছপালার মধ্যে থেকে অসংখ্য পাখীর কলরব ভেসে আস্ছে, যেন হাজার পাখীর বাজার বসে গেছে।

আনন্দে হাত তালি দিয়ে বাহাদুর বল্লে "হুর্‌রে, কি সুন্দর জায়গা এটা, ভালো করে লক্ষ্য করে' ছাখো শঙ্কর, ঝিলের পাশ দিয়ে মনে হচ্ছে যেন একটা পায়ে হাঁটা রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে গেছে।"

এটা আমিও লক্ষ্য করেছি। বল্লাম "এখানে বোধহয়

মানুষ বাস করে, না হলে এই রাস্তা হবে কি করে ? মানুষের পায়ে চলা পথ বলেই মনে হচ্ছে।”

“আমারও তাই ধারণা, কিন্তু বুঝে উঠ্‌তে পারছি না—কোন্ জাতীয় মানুষ এখানে বাস করে। জাহাজের কাপ্তেনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে।”

“একটা জিনিষ লক্ষ্য করছ বাহাদুর—এখানকার গাছপালা-গুলো কি রকম ক্ষুদে ক্ষুদে। নারকেল গাছ, সুপারি গাছ, বাঁশঝাড়, সবই যেন আমাদের দেশের গাছের প্রায় অর্দ্ধেক।”

“আরে তাইত, এতক্ষণ তো আমার এ বিষয়ে কোনো খেয়ালই হয় নাই। বাস্তবিকই বড় অদ্ভুত ব্যাপার। গাছগুলিও যেমন বেঁটে পাতাগুলোও তেমনি ছোট ছোট।”

“অনেক দূর এসে পড়েছি, চল এবার ফেরা যাক।” আমি বল্লাম।

‘হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বাহাদুর বল্লে—“ফিরব তো নিশ্চয়ই, মোটে এখন বেলা বারোটা, জাহাজ ছাড়বার সময় পেট ঠেসে খেয়ে আসা গেছে, এত তাড়া কিসের ? চল এই রাস্তাটা ধরে’ আরো কিছুদূর যাওয়া যাক। এর পর আবার তো সেই একঘেয়ে জলের পথ।”

আমারো দ্বীপটা খুব ভালোই লাগছিল—তবু বল্লাম “একেবারে অজানা জায়গা, খালি হাতে এসেছি, যদি কোনো জন্তু জানোয়ারের সামনে পড়ি বিপদে পড়তে হবে।”

"হ্যাঁ, সে ভয় আমিও করতাম, কিন্তু দেখছ না ধারে কাছে কোথাও জঙ্গলের চিহ্ন মাত্র নাই। ঝিলের ধারে ফাঁকা ফাঁকা গাছপালা একেবারে পরিষ্কার"—এই পর্য্যন্ত বলে হঠাৎ বাহাদুর থম্‌কে থেমে গেল, তারপর ঝিলের বাঁকের মুখে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্লে "ওটা কি জল খাচ্ছে ?"

"বাছুর"……

"উঁহু, বাছুর নয়, দস্তুর মত শিংওলা গরু, ওই ছাখো তার পাশেই বাছুর।"

"আরে একি কাণ্ড!" আমি অবাক হয়ে বলে উঠ্‌লাম "এত ক্ষুদে গরু আমিতো কখনো দেখি নাই, আরে হো হো, ঐ যে বাছুর, আমাদের দেশের বেড়ালও যে ওর চেয়ে আকারে বড়।"

বাহাদুর তার দিকে একটা ঢিল টিপ করে' মারতেই গরুটা চার' পা তুলে ল্যাজ উঁচু করে' ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাল, তার পিছনে পিছনে ছুটল তার পুচ্‌কে বাছুরটা।

আমি আর বাহাদুর এই দেখে হেসেই আর বাঁচি না।

এতক্ষণ ফুরফুরে হাওয়া বইছিল, এইবার মনে হোলো হাওয়ার ধরণটা যেন বদ্‌লে গেছে, অনেকটা ঝোড়ো হাওয়ার মত এলো-মেলো বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম পূব আকাশের এক

সাগরের জল ঘুরতে ঘুরতে ফেঁপে ফেঁপে শূন্যে ফুলে
আকাশ-স্পর্শী জলস্তম্ভের সৃষ্টি করলো। —২১ পৃষ্ঠা

প্রান্ত থেকে যেন একখণ্ড কালো মেঘ বাতাসে ভেসে আসছে।

ঝড়ের পূর্ব্বাভাস! ঝিলের ধারে গাছে গাছে যে-সব পাখীরা এতক্ষণ কোলাহল করছিল, তারা এইবার ডানা ঝট্‌পট্ করতে করতে উড়ে' পালাতে লাগ্‌ল।

বাহাদুর বল্লে "আর নয়, এইবার ফিরে চল জাহাজের দিকে, ঝড় আস্‌ছে, অনেকদূর এসে পড়েছি, এস দৌড়ানো যাক্।"

আমি আর বাহাদুর প্রায় একরকম ছুটেই চল্লাম।

বাতাসের জোর ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে। যত সামনের দিকে ছুটে চলতে যাই—ততই ঝড়ের ঝাপটায় গতিরোধ হয়ে যায়। চোখে মুখে ধূলো বালি এসে ঢুক্‌তে থাকে।

তবু আমরা ছুটে চলেছি প্রাণপণে। ঝড় এবার প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করেছে। চতুর্দ্দিকে বাতাসের সে কি আতঙ্কর হুঙ্কার। সামনে পিছনে কোথাও আর দৃষ্টি চলে না। চারিধারে আঁধির অন্ধকার।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। বাহাদুর আমাকে টেনে তুলে হাত ধরে' ছুটে চল্ল, এ যেন অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে!

সমুদ্রের ধারে এসে পৌছেছি। সমুদ্রতীর জনমানবশূন্য। যাত্রীদল সবাই জাহাজে ফিরে গেছে। আমরা জাহাজে

ফিরে যাব এমন একখানা বোটও তারা রেখে যায় নি।

সমুদ্রের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর। পাহাড়ের সমান এক একটি ঢেউ উঠছে, আর ভীম গর্জ্জনে বেলা-ভূমিতে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। সমস্ত সমুদ্র যেন আজ ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্ষেপে উঠেছে—মেতে উঠেছে। কে বেশী দুরন্ত—কে বেশী দুর্দ্দান্ত এরই যেন পরীক্ষা আজ।

আমাদের জাহাজের অবস্থাও সঙ্গীন। সাগরের নাগর-দোলায় তার দুর্দ্দশার একশেষ, বুঝি আর টাল সামলাতে পারে না।

তারপর, চোখের সামনে দেখলাম. সাগরের জল হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে ফেঁপে কেঁপে শূন্যে ফুলে উঠল অতি প্রচণ্ড ভাবে, তারপর, সেই ভীষণ জলস্তম্ভ যেই ভেঙ্গে আবার আছড়ে পড়ল তার তোড়ে আমাদের জাহাজখানা নোঙর ছিঁড়ে তীরের মত একদিকে ছুটে চলে গেল। আর কিছুই দেখতে পেলাম না। অশান্ত বাতাসের দৌরাত্মে প্রশান্ত আকাশ-খানাও যেন আজ নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে, বজ্রের ধমকানিতে, বিদ্যুতের চমকানিতে থর্ থর্ করে সমস্ত ধরণী যেন কেঁপে উঠ্ছে।

আর্ত্তকণ্ঠে বাহাদুর বল্লে "টাইফুন, অতি সাঙ্ঘাতিক ঝড়। চীন সমুদ্রে মাঝে মাঝে জাহাজকে এই ঝড়ের মুখে পড়তে হয়।

এই সব দেখে শুনে আমার বাক্‌শক্তি লোপ পেয়ে গেছে। অন্তরাত্মা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

সাহস দিয়ে বাহাদুর বল্লে "বেশী ভয় পেওনা শঙ্কর, ঝড় থামলেই, জাহাজ আবার আমাদের খোঁজে এখানে আসবে।"

ছয়
তিমিঙ্গিল

ঝড় থেমে গেছে।

আকাশ আবার সুস্নিগ্ধ সুনীল, বাতাস ধীর স্থির, সাগর যেন পূর্ব্বের চেয়েও শান্ত, গম্ভীর।

এ যেন প্রকৃতির একটা অভিনয় হয়ে গেল।

বাহাদুর বল্লে "সমুদ্রের উপকূলেই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, জাহাজ নিশ্চয়ই আবার ফিরে আমাদের উদ্ধার করতে আস্‌বে।"

—"এই উদ্দাম ঝড়ে কি আর জাহাজ রক্ষা পেয়েছে বাহাদুর? সমুদ্রের যে প্রলয়ঙ্কর অবস্থা স্বচক্ষে দেখ্‌লাম তাতে জাহাজ বাঁচ্‌তে পারে না কিছুতেই। আর যদিও বা রক্ষা পায় তবে কোথায় যে ছট্‌কে চলে গেছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই।"

বাহাদুর বল্লে—"টাইফুন ঝড়ের মুখে মাঝে মাঝে পড়তে হয় বলে এইদিকের সব জাহাজই প্রায় প্রস্তুত থাকে। জাহাজের কাপ্তানরা এমন কতগুলি কায়দা কানুন জানেন, যাতে শত ঝড়-ঝাপ্‌টাতেও জাহাজের বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। তবে যদি ঝড়ের তোড়ে জাহাজ বিপথে গিয়ে

কোনো চড়ায় কিম্বা পাহাড়ে ধাক্কা খায় তবে অবশ্যি-আলাদা কথা। যা হোক্, এই জাহাজের জন্যে আমাদের এখন অপেক্ষা করতেই হবে। না হলে এই অজানা দ্বীপে আমাদের অবস্থাও হয়ে উঠ্‌বে অতি শোচনীয়।”

“তা ছাড়া আর উপায় কি। ভাগ্যিস্ বুদ্ধি করে গরম জামা গায়ে দিয়ে এসেছিলাম, নইলে এতক্ষণ শীতে কাঁপ্‌তে হোতো। বেলা এখন ক'টা হবে বাহাদুর?”

আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বাহাদুর হঠাৎ চমকে উঠে বল্লে—“ওটা কি? ওই যে তীরের এক পাশে পাহাড়ের মত পড়ে আছে!”

তাইত ওটা কি? কিছুক্ষণ আগেও তো ও জায়গাটা ছিল একদম ফাঁকা, শুক্‌নো বালুর চরা……, আমাদের চোখের ভুল নয় তো?

কাছে গিয়ে যা দেখ্‌লাম তাতে আমাদের চক্ষু স্থির।

বিপুল আকারের একটা জীব চরার উপর উল্‌টে পড়ে' আছে। আকারটা মাছের মত, অনেকটা তিমির মত। কিন্তু তিমি নয় কখনই! তিমি এত বড় হতে পারে না কিছুতেই। দশটা তিমি মাছ পর পর রাখলেও বোধ হয় আকারে এর সমান হয় না।

ছেলেবেলায় ‘তিমিঙ্গিল’ নামে এক সামুদ্রিক জীবের কথা পড়েছিলাম। এ তা নয় তো? তিমি মাছকে গিলে খায়

বলে নাম 'তিমিঙ্গিল'। এ জানোয়ারটাও ইচ্ছে করলে অনায়াসে তিমি মাছ গিলতে পারে।"

বাহাদুর বল্লে "এতক্ষণে ব্যাপারটা কিছু বোঝা গেছে।"

"কী ব্যাপার বাহাদুর ?"

"কাল শেষ রাত্রের ঘটনাটা ভুলে গেলে এরই মধ্যে ? তিন তিন বার আমাদের জাহাজটাকে উল্‌টে ফেলতে চেষ্টা করেছিল কোনো এক অজানা জীব, মনে পড়ে ?'

সম্ভব, সম্ভব, এই বিরাট রাক্ষুসে জীবটা ইচ্ছে করলে আমাদের জাহাজটাকে চূর্ণ করে' দিতে পারত, উল্‌টে ফেলা তো তার কাছে অতি সহজ ব্যাপার। আমার সমস্ত শরীরটা শির্‌শির্ করে' উঠ্‌ল।

স্পষ্ট বুঝতে পারছি জীবটার ধড়ে প্রাণ নাই, তবুও বেশী কাছে যেতে ভরসা পাচ্ছি না।

বাহাদুর বল্লে "টাইফুনের তোড়ে জানোয়ারটা ডাঙ্গায় এসে আছ্‌ড়ে পড়েছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় দফা শেষ।"

"যাক্ এখন আর প্রাণীতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে' বিশেষ কিছু লাভ নাই বাহাদুর। এমন একটা আশ্রয় খুঁজি চল, যেখান থেকে জাহাজকেও লক্ষ্য করা যাবে আর বিশ্রামও করা চলবে। বড় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি।"

"ঐ যে কিছু দূরে বালুচরার শেষে কয়েকটা গাছের নীচে

কতগুলি বড় বড় পাথর রয়েছে, চল আপাততঃ ওখানে গিয়েই আশ্রয় নেওয়া যাক্। বেলা চারটা বেজে গেছে। শীতের বেলা, এর ভিতরেই রোদ ঝিমিয়ে এসেছে। আমার স্থির বিশ্বাস জাহাজ আমাদের উদ্ধার করতে নিশ্চয়ই আবার ফিরে আস্‌বে।”

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। বাহাদুরের কথায় আমারও বিশ্বাস জন্মে গেছে, জাহাজ আবার আসবেই।

সাত
এ কোন্ দেশ ?

গাছের তলায় পাথরের পাশে আমরা এসে বস্‌লাম। নীচে গদির মত শ্যামল ঘাসের কোমল আস্তরণ, দুই দিকে দুটো বড় পাথর পাশাপাশি দেওয়ালের মত দাঁড়িয়ে, সামনের দিকটায় কোনো আড়াল নেই একেবারে ফাঁকা। এখান দিয়ে সীমাহীন সমুদ্র অবাধে আমাদের চোখে পড়ছে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এলো। শীতকাল হলেও আমাদের দেশের মত অতটা শীত বোধ হচ্ছে না। অনেকটা আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের মত।

বাহাদুর বল্লে—"ভারী সুন্দর জায়গায় আশ্রয় নিয়েছি আমরা, দুই দিকে পাথরের দেওয়াল, একদিকে গাছের আড়াল, উপরে গাছের পাতার ছাদ, আর নীচে ঘাসের গদি, ভগবান যেন আগে থেকেই আমাদের জন্যে এ ব্যবস্থা করে' রেখেছেন।"

"কিন্তু চারিদিকে যে ঘোর অন্ধকার নেমে আস্‌ছে, জাহাজের তো কোনো চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না।"

"ব্যস্ত হচ্ছ কেন শঙ্কর, জাহাজ আস্‌ছে কি না এখন আমরা 'সার্চ্চ লাইটের' আলোতেই দূর থেকে সেটা বুঝ্‌তে পারব।"

"সমস্ত রাত তো আর এইভাবে তাকিয়ে থাকা যাবে না। মনে কর যদি ঘুমিয়ে পড়ি।"

"ঘুমিয়ে পড়লেই বা ক্ষতি কি, জাহাজের ভেঁপু তো বাজ্‌বে, তাতেই আমাদের ঘুম ভেঙে যাবে। আর একান্ত যদি ঘুম না-ই ভাঙে তবে তারা তো আর এমনি ফিরে যাবে না। অবশ্য আমাদের গোঁজ করবে।"

রাত গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে পেটের ক্ষিধেও হু হু করে বেড়ে চলেছে। বাহাদুরকে বল্লাম "খিদের চোটে যে নাড়ী ভুঁড়িগুলি টন্ টন্ করছে, সেই সকাল বেলা জাহাজ থেকে আস্‌বার সময় কিছু খেয়েছিলাম, তারপর আর কিছুই পেটে পড়ে নাই।"

চেয়ে দেখলাম বাহাদুর পাথরে ঠেস্ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, আমার কথাগুলি তার কাণেই গেল না।

অগত্যা আর কি করি। বাহাদুরকে জাগিয়েই বা কি ফল। এত রাত্রে এই বিদেশে বিভুঁয়ে খাবার কোথায় পাওয়া যাবে? কাল ভোরে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। আর ভাগ্যক্রমে যদি রাত্রের মধ্যে আমাদের জাহাজ ফিরে আসে তবে তো আর কথাই নাই।

এই কল্পনা করতে করতে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম।

কোথা দিয়ে যে রাত কেটে গেল বুঝতে পারি নাই। হঠাৎ কিসের গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে চেয়ে

দেখি ভোর হয়ে এসেছে, পূব আকাশ লালে লাল, আর তার 'আলোতে সমুদ্রের' দিগন্ত সীমার খানিকটা অংশ তরল আবীরের মত টল্ টল্ করছে।

বাহাদুর আগেই উঠে বসেছে। আমাকে জাগতে দেখে ফিস্ ফিস্ করে' বললে—"ঐ শোনো মানুষের গলার শব্দ।"

লক্ষ্য করে শুনলাম, যেন অনেক লোক এক সঙ্গে কোলাহল করছে।

তবে কি আমাদের খোঁজ করতেই জাহাজের লোকজন এদিকে আস্‌ছে? কিন্তু জাহাজ কৈ?

বাহাদুর বললে "ব্যাপারটা আমাদের গোপনে দেখতে হবে। এই দ্বীপটি আমাদের সম্পূর্ণ অজানা, আমার বিশ্বাস এই দ্বীপের বাসিন্দারাই সমুদ্রের ধারে ঐ রকম হট্টগোল জুড়ে দিয়েছে। ওরা কি প্রকৃতির লোক আমাদের জানা নেই, নরখাদকও হতে পারে। কাজেই অতি গোপনে আমাদের সমস্ত জানতে হবে।"

বাহাদুরের কথায় আমার আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হোলো না। শেষে কি মানুষ খেকো রাক্ষসদের হাতে পড়তে হবে?

বাহাদুর বললে "এখন ভয় পেলে চলবে না। সমস্ত রাতের মধ্যে যখন জাহাজ ফিরল না, তখন তার ভরসা আর করা যায় না, এখন আমাদের উদ্ধার পাবার অন্য উপায় দেখতে হবে।"

এবার আমার মুখ দিয়ে কথা ফুটল। বল্লাম “তুমি কি বলতে চাও, এখানকার ঐ অসভ্য অধিবাসীরা আমাদের উদ্ধারের সাহায্য করবে।”

—“ওরা সভ্য কি অসভ্য তা তো আর আন্দাজে বলা যায় না, চল দূর থেকে ওদের ধরণ-ধারণটা লক্ষ্য করি।”

আমি বল্লাম “এস, এক কাজ করা যাক্। কোথাও গিয়ে কাজ নাই, এই যে পাথরের পাশে ঝাঁক্ড়া গাছটা আছে তার উপর উঠে ব্যাপারটা লক্ষ্য করি।”

—“ঠিক বলেছ শঙ্কর, গাছের উপর উঠলে আমরা পরিষ্কার সব দেখতে পাব, কিন্তু ওরা আমাদের দেখতে পাবে না।”

গাছের উপর উঠে যে দৃশ্য দেখ্লাম, তা আর জীবনে ভুলবার নয়।

সেই রাক্ষুসে সামুদ্রিক জীবটা তখনো তীরের উপর পড়ে আছে, আর তাকে ঘিরে হাজারে হাজারে অসভ্য শিশু বর্শা, কুড়ুল ও টাঙ্গি দিয়ে জন্তুটাকে সবলে আঘাত করছে, তার মাংস টুক্রো টুক্রো করে’ কাট্‌ছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে উৎকট চীৎকার করছে।

আমি অবাক্ হয়ে বল্লাম “ছোট ছোট ছেলেগুলিতো বেশ মজার খেলা পেয়েছে দেখ্‌ছি।”

—“আরে কি বলছ শঙ্কর, ছোট ছেলে তুমি দেখলে কোথায়? ভালো করে’ লক্ষ্য করে’ ছাখো প্রত্যেকের

মুখেই বড় বড় গোঁফ, কারুর কারুর আবার পাকা দাড়ীও আছে।"

একি স্বপ্ন দেখছি নাকি? না, গ্যালিভারের সেই লিলি-পুটদের দেশে এসে পড়লাম।

আমি অবাক হয়ে বল্লাম—"এত ক্ষুদে মানুষ যে হতে পারে এ যে কল্পনারও অতীত। আমাদের দেশের পাঁচ ছয় বছরের ছেলেরাও যে আকারে এদের চেয়ে বড়।"

বাহাদুর বল্লে—"মনে পড়ছে সেই ক্ষুদে গরু আর বাছুরের কথা, ঐ যে ঝিলের জল খাচ্ছিল, আমার এক ঢিল খেয়ে বোঁ বোঁ ছুটে পালাল! এখন বুঝতে পারছি এদেশের মানুষগুলো যেমন বেঁটে, জন্তু জানোয়ারগুলিও ঠিক তেমনি।"

—"আর গাছপালা গুলিও বেঁটে বেঁটে তা আমরা প্রথম দ্বীপে নেমেই লক্ষ্য করেছি।"

আট

বিপদের মুখে

অনেকক্ষণ এইভাবে কাট্‌ল।

ক্ষুদে মানুষগুলি মহা উৎসাহে সেই জন্তুটার মাংস টুক্‌রো টুক্‌রো করে' কেটে ছোট ছোট ঝুড়ি গুলি ভর্ত্তি করতে লাগ্‌ল।

যতটা সম্ভব মাংস তারা সংগ্রহ করেছে, এবার বোধহয় তারা বাড়ীর দিকে যাবে ভোজের আয়োজন করতে।

আরে সর্ব্বনাশ! দল বেঁধে ওরা যে এই দিকেই আস্‌ছে। এই দিক দিয়েই কি ওরা যাবে নাকি?

বাহাদুর বল্লে "গাছের পাতার আড়ালে চুপ্‌চাপ্‌ গা ঢাকা দিয়ে বসে থাক, ওরা যেন আমাদের কথা ঘুণাক্ষরেও না জান্‌তে পারে। ওদের দল বেশ পুরু, আমরা দুজনে মিলে কিছুতেই ওদের সঙ্গে এঁটে উঠ্‌ব না।"

আমি চাপা গলায় উত্তর দিলাম "লোকগুলি আকারে ক্ষুদ্র হলেও প্রকৃতি অতি হিংস্র বলেই বোধ হচ্ছে।"

আমি আর বাহাদুর একটা ঝোপ্‌ড়া ডালের আড়ালে কোনো রকমে আত্মগোপন করে' রইলাম।

তারা মহা উল্লাসে হল্লা করতে করতে আমাদের গাছের দিকেই আস্‌ছে।

আমি হঠাৎ বলে' উঠলাম "এই যাঃ সর্ব্বনাশ, আমি গায়ের গরম কোটটা নীচে ফেলে এসেছি। যদি ওদের নজরে পড়ে' যায় তবেই কিন্তু ওরা কোটের মালিককে খোঁজ করবে।"

হঠাৎ গরম লাগায় পাথরের আড়ালে আমার কোটটা খুলে রেখে এসেছিলাম।

বাহাদুর নীচের দিকে উঁকি মেরে দেখে বল্লে "তোমার জামাটা পাথরের এক কোণে পড়ে' আছে, বোধহয় ওদের নজরে পড়বে না। যা হোক, নীচে নেমে গিয়ে কোট্‌টা নিয়ে আস্‌বার আর সময় নাই। যা হয় হবে, এখন চুপ্‌ কর শঙ্কর।"

আমি তো চুপ্‌ করলাম কিন্তু অন্তরাত্মা ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক্‌ ছাড়তে আরম্ভ করল।

লোকগুলো আমাদের গাছের নীচে এসে জমায়েৎ হোলো, তারপর মাংসখণ্ডগুলি স্তূপাকার করে' রাখল গাছের গুঁড়ির কাছে।

আমার আর বাহাদুরের কারুরই মুখে কথা নাই। দেখা যাক্‌ এর পর কি ঘটে!

গাছের গুঁড়ির ধারে প্রকাণ্ড এক চুল্লী তৈরি হোলো, তারপর লোকগুলি মাংসের স্তূপগুলি তার ভিতর রেখে দিল আগুন ধরিয়ে।

আমাদের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগ্‌ল, চোখে যেন ঝাপ্‌সা অন্ধকার নেমে এল।

দাউ দাউ করে' আগুন জ্বলে উঠ্‌ল, আর সেই আগুনের লক্‌লকে শিখা আর গন্‌গনে ফুলকি গাছের উপরে আমাদের গায়ে এসে লাগ্‌তে লাগ্‌ল।

হায়, হায়, হায়,—এবার বুঝি আর রক্ষা নাই, এই আগুনেই বুঝি ঝল্‌সে পুড়ে মরতে হয়।

নীচে তুমুল কাণ্ড, সেই অসভ্য লোকগুলি আগুনের কুণ্ড ঘিরে ঘিরে ধেই ধেই করে' নাচ জুড়ে দিয়েছে আর কিম্ভুত গলায় অদ্ভুত গান গাইছে।

আমরা যতটা সম্ভব গাছের আগ্‌ডালে গিয়ে উঠে বসেছি, কিন্তু সেই সর্ব্বনেশে আগুনের লেলিহান জিভ এখানেও আমাদের গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

কাতর কণ্ঠে বাহাদুরকে বল্লাম "আর যে পারছি না বাহাদুর, আগুনের হল্‌কায় সমস্ত শরীরে ফোস্কা পড়বার জোগাড়।"

বাহাদুর বল্লে—"এস, এক কাজ করি। অনেকগুলি গাছ পাশাপাশি ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে, চল আমরা ডাল ধরে' ধরে' এক গাছ থেকে আর এক গাছে পালাই, এ ছাড়া আর উপায় নাই।"

"তাতো পালাবে, কিন্তু ওরা যদি দেখতে পায়?" আমি বল্লাম।

বাহাদুর উত্তর দিলে—"ধোঁয়ায় চারিধার ঘোর অন্ধকার, এ সময় পালাতে চেষ্টা করলে ওরা আমাদের দেখতে পাবে না। এখানে আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করা যায় না, আগুনের উত্তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে, ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে।"

অতি সন্তর্পণে, অতি ভয়ে ভয়ে আমি আর বাহাদুর গাছের ডাল ধরে ধরে এই গাছ থেকে পাশের একটি গাছে গিয়ে হাজির হলাম। এখান থেকে অনায়াসে আমরা অন্য গাছের সাহায্যে পালাতে পারব।

বাহাদুর বল্লে "খুব হুঁশিয়ার শঙ্কর, এই গাছের সাহায্যেই আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে।"

—"পালাবে কোথায় বাহাদুর? সমস্ত দ্বীপটাই যে আমাদের অজানা।"

—"তা হোক, তবু এই লোকগুলোর নজরে যাতে না পড়ি তার চেষ্টা করতে হবে।"

আগুনে সেই মাংসের স্তূপ যতই পুড়ছে, লোকগুলোর উল্লাসের মাত্রা যেন ততই বেড়ে বেড়ে উঠছে। তাদের উৎকট চীৎকারে আমাদের মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, বুক ধুক ধুক করছে।

এক গাছ থেকে আর এক গাছ—এমনি করে'করে' আমরা অনেকটা দূর এসে পড়েছি, আর একটু দূর যেতে পারলেই অনেকটা নিরাপদ জায়গায় যেতে পারব, জীবন্ত পুড়ে মরবার আর ভয় নাই।

এমনি করে' গাছ ধরে' এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ গাছের একটা পল্‌কা ডাল মড়্ মড়্ করে' গেল ভেঙ্গে'। আমি সবেগে নীচে পড়ে যাচ্ছি দেখে বাহাদুর তাড়াতাড়ি এক হাত দিয়ে আমাকে যেই রক্ষা করতে গেল, তারও হাত গেল ফস করে' ফস্‌কে। আমরা দুজনে ঝুপ্ ঝুপ্ করে' নীচে পড়ে গেলাম।

কি হোলো না হোলো, শরীরের কোথায় চোট লাগল, কতখানি জখম হোলো, এসব ভাববার আর সময় হোলো না।

বাহাদুর চট্ করে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"ঐ, ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে, ঐ যে ছুটে আস্‌ছে দলে দলে, আর এক মূহূর্ত্তও দেরী নয়, পালাও শঙ্কর সামনের দিকে—" এই বলে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে লাগল, আমিও তার পিছনে পিছনে ছুট দিলাম।

পিছন ফিরে তাকাবার ফুরসৎ নাই, পথ বিপথ বিচার করবার সময় নাই, কেবল ছুট্‌ছি যেদিকে দুই চোখ যায়।

পিছনের সেই উদ্দাম কোলাহল যেন ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে।

নয়

আশ্চর্য্য পরিত্রাণ

ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমরা এসে পড়লাম সেই ঝিল্‌টার কাছে

লোকগুলি আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বোধহয় পেরে ওঠে নি। পিছন ফিরে আর তাদের দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

বাহাদুরকে বল্লাম "বাহাদুর, আর যে ছুট্‌তে পারি না, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় আর পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন, আর দাঁড়াতে পারছি না, শরীর থর্ থর্ করে' কাঁপছে।"

"আমারও সেই অবস্থা শঙ্কর, এস এই বাঁশঝাড়ের আড়ালে একটু বিশ্রাম করি, তারপর যা হয় করা যাবে। ওরা বোধহয় আমাদের নাগাল না পেয়ে আবার সমুদ্রের ধারে ভোজের আয়োজন করতে ফিরে গেছে।"

বাহাদুরের মুখের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শন্‌শন্ করে' দুটো ধারালো বর্শা আমাদের প্রায় গা ঘেঁসে সবেগে বেরিয়ে গেল। উঃ, একটুর জন্যে আমাদের গায়ে লাগে নি।

এক নিঃশ্বাসে বাহাদুর বলে উঠল—ঝিলের জলে ঝাঁপিয়ে পড় শঙ্কর যদি বাঁচ্‌তে চাও, ঐ ছাখো শয়তানের দল ঢালু পথ দিয়ে ক্ষুদিত নেকড়ের পালের মত ছুটে আস্‌ছে।

কোথায় গেল ক্লান্তি, কোথায় গেল অবসাদ, সমস্ত শরীর আতঙ্কে শিউরে উঠল। আর এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করে' আমি আর বাহাদুর ঝুপ্‌ঝুপ্ করে' জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে' জোরে জোরে সাঁতার কেটে এগিয়ে চল্লাম।

ওরা বোধ হয় সাঁতার জানে না। ঝিলের ধারে দাঁড়িয়ে নিস্ফল আক্রোশে কাণ-ফাটানো চীৎকার সুরু করে দিল, আর আমাদের মাথা লক্ষ্য করে' করে' তীর, বর্শা ও ছোট ছোট পাথরের নুড়ি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল।

জীবনে এই বোধহয় প্রথম ওরা আমাদের মত দীর্ঘাকৃতি মানুষের দেখা পেয়েছে, তাই আমাদের দেখে ওদের এত কৌতূহল, আমাদের ধরবার জন্যে ওদের এত উৎসাহ, আগ্রহ!

ওদের অস্ত্রের হাত থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে আমরা ডুব সাঁতার দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। প্রতি মুহূর্ত্তে অস্ত্রবিদ্ধ হবার আশঙ্কা।

শীতকাল হলেও, ঝিলের জলটা বেশ গরম ও আরামপ্রদ, তাই বেশী কষ্ট হচ্ছিল না।

সাঁতার কাট্‌তে কাট্‌তে আমরা অনেক দূরে চলে এলাম।

বাহাদুর বল্লে—"এইবার ওঠা যাক্ শঙ্কর, ওরা আর আমাদের ধরতে পারবে না, অনেক দূর এসে পড়েছি।"

"উঁহু, এখানে উঠে দরকার নাই, ওই ছাখো ঝিলের ধারে ধারে ছোট ছোট সব কুটীর দেখা যাচ্ছে, নিশ্চয়ই এটা ঐ

ক্ষুদে লোকগুলির গ্রাম। আর ওদের পাল্লায় পড়তে রাজী নই।"

কাণ পেতে শুন্‌লাম 'দুম্ দুম্' করে' ঢাকের আওয়াজ আস্‌ছে, লোকজনের গোলমালও যেন কানে এলো।

—"এখন বেলা ক'টা হবে বাহাদুর! দ্যাখোতো ঘড়িটা।"

—"ঘড়ি কি আর আছে শঙ্কর, কোথায় কখন যে পড়ে গেছে টের পাই নি। ঘড়ি যাক্, প্রাণটা যে এখন পর্য্যন্ত বেঁচে আছে—এটাই যথেষ্ট।"

"—সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ, বাহাদুর আর বাঁচ্‌বার আশা নাই, পিছন দিক থেকে ছোট ছোট কয়েকটা ডিঙ্গি করে' ঐ দ্যাখো শয়তানের দল অস্ত্র বাগিয়ে আমাদের দিকে ধাওয়া করেছে।"

ডাঙ্গায় উঠে পড় শঙ্কর, আর জলে থাক্‌লে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।"

—"ডাঙ্গায় উঠ্‌বে কোথায়? ঐ দ্যাখো আর একদল ক্ষুদে মানুষ ঢাক বাজাতে বাজাতে জলের দিকে আস্‌ছে। ওদের হাতে পড়লেও অবস্থা শোচনীয় হবে সন্দেহ নাই।"

বাহাদুর বল্লে—"এখন একমাত্র উপায়, ডুব সাঁতারে ওদের ফাঁকি দেওয়া। এক ডুবে যদি আমরা ওদের ডিঙ্গিয়ে পিছনে চলে যেতে পারি তবে অনেকটা বিপদ কাটে। যাক্ আর ভাববার সময় নাই। এস ডুব দেওয়া যাক্।"

ডিঙ্গির লোকগুলি আমাদের মাথা লক্ষ্য করে, যেই অস্ত্র

চালাল সঙ্গে সঙ্গে আমরা গভীর জলে ডুব দিলাম। ওদের অস্ত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ছুটে গিয়ে লাগল ঐ ডাঙ্গার কয়েকটা লোকের গায়ে।

ডুব সাঁতারে একটু নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আমরা যা' দেখলাম তাতে আমাদের চক্ষু স্থির!

ডাঙ্গার লোক আর ডিঙ্গির লোক এই দু'দলের মধ্যে বেধে গেছে ভীষণ মারামারি। দুই পক্ষই অজস্র অস্ত্র বর্ষণ করছে দুই পক্ষের উপর। তাদের ভয়ঙ্কর ঢাকের শব্দে, আতঙ্ককর গর্জ্জনে সমস্ত দ্বীপটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

বাহাদুর বল্লে—"উঃ মস্ত সুযোগ পাওয়া গেছে, এস শঙ্কর আমরা এই ফাঁকে পালাই।"

দশ

বিশ্রামের আয়োজন

ওদিকে দুই দলে ভীষণ মারামারি বেধে গেছে,—আর এদিকে আমরা সাঁত্‌রে তীরে এসে উঠলাম। আমাদের আর কেউ লক্ষ্য করল না।

গায়ের সমস্ত জামা কাপড় ভিজে চুপ্‌চুপে,—শীতে শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।”

বাহাদুর বল্লে—“ভাগ্যিস্ সাঁতারটা ভালো ক'রে জানা ছিল—না হলে আজ আর রক্ষা ছিল না কিছুতেই।”

সত্যিই তাই,—বাহাদুর সাঁতারে একেবারে পাকা ওস্তাদ, —আমিও ছেলেবেলা থেকে জলের দেশেই বাস করছি,— কাজেই অন্য বিদ্যা থাক্ আর না' থাক্, সাঁতার বিদ্যাটা বেশ ভাল রকমেই আয়ত্ত ছিল।

ভগবানের অশেষ দয়া। ঝিলের ধারে পানিফল জাতীয় একরকম ফলের গাছ দেখতে পেলাম, তাতে অজস্র ফল ফলে আছে।

পেটুকের মত দু'জনে পেট পুরে সেই ফল খেলাম। শরীরটা যেন অনেকটা তাজা মনে হ'ল। ক্ষুধার্ত্ত দুর্ব্বল শরীরের উপর দিয়ে এতক্ষণ যা উত্তেজনা আর পরিশ্রম গেছে, তা আর ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। নেহাৎ প্রাণের

দায়েই অবসন্ন শরীর মন নিয়েও এতক্ষণ অস্বাভাবিক ভাবে আমরা যুঝেছি। কথায় বলে,—জলমগ্ন মানুষ সামনে খড়-কুটো যা পায় তাই আঁকড়ে ধরেও বাঁচতে চেষ্টা করে—আমাদের অবস্থাও অনেকটা তাই। কেবল বাঁচতে চেষ্টা করেছি মাত্র,—কেমন করে যে বেঁচে গেছি তা বল্‌তে পারি না।

ঝিলের এই ধারে খানিকটা ঝোপ-জঙ্গলের মত, তার পরেই ফাঁকা মাঠ ধূ-ধূ করছে।

ভালো করে' লক্ষ্য করে' দেখলাম মাঠের একদিকে ছোট খাট পাহাড়ের মত কি জানি একটা দেখা যাচ্ছে।

বাহাদুর বল্লে—"শঙ্কর, বেলা পড়ে এসেছে, চল—ঐ পাহাড়টা লক্ষ্য ক'রে আমরা হাঁটি, যদি সম্ভব হয় ওখানেই রাত কাটাবার মত কোনো নিরাপদ জায়গা ঠিক করে নেব।"

"—কিন্তু এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার পাবার কি উপায়—কিছু ঠিক কর্‌তে পেরেছ বাহাদুর? শেষে কি এই অজানা অচেনা দ্বীপেই আমাদের বাকী জীবনটা বন্দী হয়ে কাটাতে হবে? বাপ্‌রে, দ্বীপের ঐ বেঁটে বাসিন্দাগুলি কী ভয়ঙ্কর!"

—"ওঃ, আজ ভাগ্যের জোরে রক্ষা পাওয়া গেছে, ভাগ্যিস্ দুই দলে মারামারি বেধে গেছিল! না হলে এতক্ষণ আমাদের বরাতে কি হোত,—কে জানে!

বল্লাম,—"আচ্ছা বাহাদুর, ডিঙ্গির লোকগুলোতো বুঝলাম

আমাদের সেই আক্রমণকারীর দল, ঐ ডাঙ্গার লোকগুলি কে? ওরা ঢাক বাজিয়ে কেনই বা দল বেঁধে আসছিল, কিছু বুঝতে পারলাম না।"

"আমার মনে হয়, যারা ঢাক বাজিয়ে ঝিলের ধারে আস্‌ছিল তাদের বোধ হয় কোন উৎসব আজ। তুমি বোধ হয় লক্ষ্য কর নি, ঝিলের ধারে একটা মস্ত গাছের তলায় একটা উঁচু বেদির মত ছিল। ওখানে বোধ হয় ওরা দেবতার পূজো দ্যায়। ঢাক বাজিয়ে ওরা ঐ দিকেই আস্‌ছিল। এমন সময় ডিঙ্গির লোকদের অস্ত্র লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়ে ওদের গায়ে গিয়ে লাগে,—তাতেই দুই দলে মারামারি বেধে যায়।"

তা হ'তে পারে।—বাহাদুর বোধহয় ঠিক কথাই বলেছে, এ ছাড়া আর কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ আমিত খুঁজে পেলাম না।

হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে আমরা পাহাড়টার কাছে এসে উপস্থিত।

ছোট্ট খাট্ট সুন্দর পাহাড়টি? চূড়ার উপর বেশ একটি ঝাঁক্‌ড়া গাছ। আমরা স্থির করলাম চূড়ায় উঠে ঐ গাছ তলায় শুয়েই আজ রাতটা কাটিয়ে দেব। নীচে থাকার চেয়ে পাহাড়ের উপরে থাকাটা অনেক নিরাপদ।

এখান থেকে সমুদ্রটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। মনে মনে আশা হলো যদি কোনো জাহাজ আমাদের দৃষ্টি পথে পড়ে তবে আমরা যে কোনো প্রকারেই হোক্ আমাদের বিপদের কথা সঙ্কেত করে জানাতে পারব।

বুদ্ধি করে’ আমরা দুজনেই যথেষ্ট পানিফল সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। আপাততঃ তাই খেয়ে আমরা বিশ্রামের আয়োজন করলাম।

পাহাড়ের চূড়ায় পছন্দ মত একটি জায়গা বেছে নিয়ে গায়ের ভিজা জামা খুলে,—কাপড়ের খুঁট গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। পাতলা কাপড় হাওয়ায় এতক্ষণ শুকিয়ে গেছিল।

শরীর ক্লান্ত, মন অবসন্ন, যেই শোওয়া অমনি ঘুম।

এগারো
আকাশ পথে

ভোরের আলো জাগবার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও জেগে উঠলাম।

মাঠের শেষেই সমুদ্র। উদ্বেলিত ঢেউগুলি তীর-ভূমিতে এসে স্বচ্ছন্দে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে পড়ছে, তার কল-কল্লোল স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছি।

গায়ের জামাগুলি গাছের ডালে ঝুলছিল। সেগুলি শুকিয়েছে কিনা পরীক্ষা করছি, এমন সময়ে বাহাদুর আমাকে বল্লে—"শঙ্কর, শঙ্কর—ঐ ছাখো মাঠের শেষে সমুদ্রের এক ধারে কি রকম বিরাট এক পাখী।"

চেয়ে দেখলাম, বিরাট আকারের একটা রাক্ষুসে পাখী ডানা ছড়িয়ে সমুদ্রের ধারে পড়ে আছে।

—"ওরে বাপরে, কি ভয়ঙ্কর পাখী ওটা, বেঁচে আছে কি মরে গেছে বুঝতে পারছি না।" —আমি ভয়ে ভয়ে বল্লাম।

বাহাদুর বল্লে—"এই দ্বীপের লোকগুলো ক্ষুদে হোলে কি হয়,—পশু পাখীগুলির আকার দেখলে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। ভেবে দ্যাখো সেই সামুদ্রিক মাছটার কথা। আর এই পাখীটাতো স্পষ্ট দিনের আলোতে চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ।"

এই পর্য্যন্ত বলে বাহাদুর মনোযোগ দিয়ে কি যেন দেখতে লাগল, তারপর আবার রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বল্লে—"ঐ দ্যাখো পাখীটার পাশে মানুষের মত কে একজন নড়া চুড়া করছে।"

আমি লাফিয়ে উঠ্‌লাম,—উল্লাসে চীৎকার ক'রে বল্লাম, —"পাখী নয় বাহাদুর,—এরোপ্লেন, এরোপ্লেন,—শীগ্‌গীর চল, যদি এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার পাবার ইচ্ছা থাকে।"

এই বল্‌তে বল্‌তে আমি অতি দ্রুতভাবে পাহাড় থেকে নাম্‌তে লাগলাম, বাহাদুরও আমার পিছনে পিছনে আস্‌তে লাগল।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে হাজির হলাম এরোপ্লেনটার কাছে।

আমাদের ঐ ভাবে ছুটে আস্‌তে দেখে এরোপ্লেন-চালক বোধ হয় ভয় পেল। বোধ হয় ভাবল দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা তাকে ধরবার জন্যে তাড়া করে আস্‌ছে। সে মুহূর্ত্তের মধ্যে এরোপ্লেনের ভিতর ঢুকে গিয়ে কল চালিয়ে দিল।

এই রে, সব যে মাটি হবার যোগাড়। যদি সে এরোপ্লেনটা নিয়ে ভয়ে পালিয়ে যায়, তবে আর উদ্ধারের কোনো আশা নাই।

লোকটি যে কোন্ দেশীয় ঠিক্ বুঝতে না পেরে চীৎকার করে ইংরাজীতে বল্লাম,—"ভয় নাই, ভয় নাই, আমরা বিপন্ন লোক, দয়া করে' আমাদের উদ্ধারের সাহায্য করুন।"

আমাদের কথা লোকটির কানে গেল। সে আবার উড়ো জাহাজ থেকে নামল—নেমে অতি কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের আপাদমস্তক লক্ষ্য করতে লাগল। ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করল,—"কি হয়েছে, কে তোমরা ?"

সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে তাকে বল্লাম। সহানুভূতি জানিয়ে লোকটি বল্লে—"আপনারা কোন্ দেশী লোক ?"

—এক সঙ্গে বাহাদুর আর আমি উত্তর দিলাম, বল্লাম —"বাঙ্গালী"।

লোকটি চম্‌কে উঠল, স্পষ্ট বাংলা ভাষায় বল্লে, "অ্যাঁ বাঙ্গালী, আমিও যে তাই। কি আশ্চর্য্য, ভগবান বোধহয় আপনাদের সাহায্যের জন্যেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। ভাগ্যিস্ কম্পাসটা খারাপ হয়ে গেছিল।"

আমাদের মুখে আর কথা নাই। প্রথমে ভাবলাম—পাহাড়ের চূড়ায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছি না তো ? এযে স্বপ্নাতীত ঘটনা—অলৌকিক ব্যাপার !

আলাপ পরিচয় জমে উঠল। যুবকটির নাম দেবকুমার। কল্‌কাতার দম্‌দম্ উড়ো ক্লাবের সভ্য। কল্‌কাতা থেকে একা এরোপ্লেন চালিয়ে রেঙ্গুনে আসে, তারপর ফিরবার মুখে কম্পাস নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দিক্ ভুল হয়ে যায়। ভারতবর্ষ ভেবে সে এই দ্বীপে আজ শেষ রাত্রে নেবেছে।

দেবকুমারের সঙ্গে প্রচুর টোষ্ট আর বিস্কুট ছিল। আমি

আর বাহাদুর পেট ভরে' পরম তৃপ্তির সঙ্গে তাই খেলাম। আজ দুই দিন প্রায় উপোস করেই কাটাতে হয়েছে।

আমাদের পেয়ে দেবকুমারেরও আনন্দের সীমা নেই। নেহাৎ সঙ্গী-বিহীন ভাবে সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে আকাশে আকাশে ঘুরে সে-ও আজ কয়েকদিন পর প্রথম লোকের মুখ দেখল। তাও আবার স্বজাতি—বাঙ্গালী। কম্পাস নষ্ট হয়ে যাওয়াতে সে আর কিছুতেই দিক্ ঠিক করতে পারছে না।

আমি বল্লাম "এরোপ্লেনের কলকব্জা ঠিক আছে তো?"

দেবকুমার উত্তর দিল—"নিশ্চয়ই, খুব দামী এরোপ্লেন, এটা সহজে নষ্ট হবার নয়। সঙ্গে পেট্রোলও প্রচুর মজুত আছে।"

আমরা এই রকম কথাবার্ত্তা বলছি এমন সময় অকস্মাৎ পিছনে দারুণ কোলাহলের শব্দ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখি হাজারে হাজারে সেই বেঁটে মানুষের দল ঝক্‌ঝকে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ভয়াবহ চীৎকার করতে করতে আমাদের দিকে তেড়ে ছুটে আস্‌ছে।

—"আপনারা চট্ করে এরোপ্লেনে গিয়ে উঠে বসুন, আর একটুও দেরী করবেন না। এই বলে দেবকুমার নিমেষের মধ্যে জাহাজে উঠে পড়ে' কল চালিয়ে দিল। সামনের দিকে খানিকটা বেগে ছুটে গিয়ে উড়োজাহাজ বোঁ বোঁ করে শূন্যে উঠে গেল।

নীচে তখন সেই সর্ব্বনেশে বামুনের দল ভীষণ আস্ফালন জুড়ে দিয়েছে

বারো
দিক্ ভুল

আকাশে তো উড়লাম। এখন যাব কোন্ দিকে? নীচে সীমাহীন নীল জল টল্‌মল্ করছে, উপরে সীমাহীন নীলাকাশ ভোরের আলোয় ঝল্‌মল্ করছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই দ্বীপটাও অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন যে-দিকে তাকাই খালি জল জল আর জল। জল আর আকাশ ছাড়া পৃথিবীতে যে আর কিছু পদার্থ আছে তা আর মনে করা যায় না।

দেবকুমার বল্লে—"কোনো সভ্য মানুষের দেশেও যদি আমরা নামতে পারি তাহলেও ভাবনা নাই। সমস্ত দেশেই এখন উড়ো জাহাজের ব্যবহার হচ্ছে। আমার কম্পাসটা ঠিক করে' নিতে পারব, বাড়ী ফিরবার আবশ্যক মত সাহায্যও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।"

বাহাদুর বল্লে—"কিন্তু সেই সভ্যদেশে যাবার উপায় কি? চীন সমুদ্রের মধ্যে ছোটখাট অনেক দ্বীপ আছে, কিন্তু সে সব জায়গায় কোন্ জাতীয় লোক বাস করে কে জানে? এক দ্বীপের পরিচয় তো আমরা ভালো ভাবেই পেয়েছি।"

আমি বল্লাম—"যেখানেই আমরা যাই, আগে ভালো করে' না বুঝে শুনে কিছুতেই সেখানে নামব না। ঘর বাড়ী, লোক-

জনদের পোষাক পরিচ্ছদ এই সব দেখেই আমরা বুঝ্‌তে পারব —কোনো সভ্য দেশে এসেছি কি না।”

দেবকুমার বল্লে—“এই চীন সাগর আগে তাড়াতাড়ি পাড়ি দিতে হবে। টাইফুনের পাল্লায় যদি পড়ি তবে আর কেউ-ই রক্ষা পাব না।”

টাইফুনের সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি, তাই বল্লাম—“ওরে বাপ্‌রে, টাইফুনের নাম শুনলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যে করেই হোক তাড়াতাড়ি এই ভয়ানক চীন সাগর আমাদের পেরিয়ে যেতেই হবে।”

বাহাদুর বল্লে—“চীন্ সাগর পার হতে গিয়ে আবার প্রশান্ত মহাসাগরের উপর না গিয়ে পড়ি, তা হলে পথ নিয়ে আরো গোলমালে পড়তে হবে।”

দেবকুমার বল্লে—“যে দিক দিয়ে সূর্য্য উঠ্‌ছে—ঐ দিকটা যখন পূব, তখন অন্য দিকগুলিও আমরা কতকটা আন্দাজ করতে পারব। সূর্য্যটাকে পিছনে রেখে যদি সোজা পশ্চিম দিকে চালাই তবে শীগ্‌গির বোধ হয় আমরা ব্রহ্মদেশের মাটি দেখ্‌তে পাব।”

এই বলে দেবকুমার জাহাজের মোড় ফিরিয়ে পশ্চিম দিকে দ্রুত বেগে চালিয়ে দিল।

আধঘণ্টা পরই মনে হোলো দূরে অতি দূরে—সমুদ্রের কোলে যেন কি একটা কালো মতন দেখা যাচ্ছে।

বাহাদুর উল্লাসে বলে উঠ্‌ল—“হুর্‌রে ঐ যে ব্রহ্মদেশের উপকূল দেখা যাচ্ছে,—আর ভয় নেই দেবকুমার বাবু। ঐ দেখুন কেমন ভস্‌ ভস্‌ করে ধোঁওয়া উঠ্‌ছে। বন্দরে নিশ্চয়ই কোনো জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে।” আমারও উৎসাহের সীমা নাই। ঘরের ছেলে আবার ভালো মতে ঘরে ফিরছি—এই মনে করে' আমার স্ফূর্ত্তি যেন প্রাণে আর ধরছে না।

কিন্তু একি হোলো। সোজা যেতে যেতে দেবকুমার হঠাৎ আবার জাহাজের মোড় ঘুরিয়ে সজোরে অন্য পথে চালিয়ে দিল কেন?

—“এখুনি হয়েছিল আর. কি,”—দেবকুমার এরোপ্লেন চালাতে চালাতেই বল্লে—“একটা আগ্নেয়গিরির কাছে গিয়ে পড়েছিলাম, ঐ দেখুন কি ভীষণ ভাবে রাশি রাশি ধোঁয়া ছাড়ছে।”

—“সর্ব্বনাশ! তবে ওটা জাহাজের বন্দর নয়?” বাহাদুর অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে।

সূর্য্য ঠিক মাথার উপর। এতক্ষণ সূর্য্যকে পূবে রেখে আমরা কোনো রকমে পথের আন্দাজ করছিলাম, এইবার সূর্য্য মাথার ওপর ওঠায় আবার সব গোলমাল হয়ে গেল।

দেবকুমার বল্লে “সন্ধ্যার আগেই আমাদের কোনো জায়গায় নাম্‌তেই হবে। এরোপ্লেনের পাখায় কেমন্‌ জানি

একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ হচ্ছে। মেরামত করা দরকার, না হলে জাহাজ বিগড়ে যেতে পারে।"

এই বলে দেবকুমার সম্পূর্ণ আন্দাজের উপর নির্ভর করে' যতটা সম্ভব দ্রুতবেগে একদিকে এরোপ্লেন চালিয়ে দিলে।

তেরো

মৃত্যুর অপেক্ষা

সমস্ত দিন আমাদের এরোপ্লেন ঝড়ের মতন অবিশ্রান্ত চলেছে।

মাঝে মাঝে কয়েকটি ছোটখাট দ্বীপ আমাদের নজরে পড়েছে বটে—কিন্তু নামবার ভরসা হয় নাই। কোনো দ্বীপেই সভ্য লোকের বাস আছে বলে আমাদের মনে হয় নাই। দুই একটি দ্বীপ আবার ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় দূরে—দিগন্ত সীমায় মনে হোলো যেন একটি ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে।

আশায় আনন্দে আমাদের প্রাণ ভরপুর হয়ে উঠল, নিশ্চয়ই এইবার কূলের সন্ধান পাব।

আলোর শিখা লক্ষ্য করে' দেবকুমার প্রাণপণে জাহাজ ছুটিয়েছে, তার প্রাণেও আজ বড় আশা, বড় উৎসাহ।

কিন্তু কোন্ জায়গা ওটা? ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, বোর্ণিও, না জাপানের কাছাকাছি এসেছি আমরা? না ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ধারে, কিম্বা প্রশান্ত মহাসাগরের কোলে নিউ-গিনীর পাশে এসে পড়েছি!

এতক্ষণ উড়োজাহাজ যে কোন্ দিকে চালিয়েছে দেবকুমার তা নিজেই জানে না।

উড়ো জাহাজ আমাদের নিয়ে বোঁ বোঁ করে শূন্যে উঠে গেল, আর নীচে সেই সর্ব্বনেশে বামুনের দল ভীষণ আস্ফালন জুড়ে দিল। —৪৯ পৃষ্ঠা

উড়োজাহাজ থেকে আমরা তাকিয়ে দেখলাম সন্ধ্যার অন্ধকারে দানবের চোখের মত জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বল্ছে একটা লাইট হাউসের আলো।

এটা তবে তীরভূমি নয়? গভীর নৈরাশ্যে আমাদের বুক ভরে' উঠল।

দেবকুমার দমবার পাত্র নয়। বল্লে,—"লাইট হাউস যখন দেখতে পেয়েছি,—তখন আর বেশী ভাব্নার কারণ নাই। সমুদ্রগামী কোনো জাহাজের সঙ্গে এখানে আমাদের সাক্ষাৎ হতে পারে, না হলেও কোনো ক্ষতি নাই,—আমার বিশ্বাস এবার আমরা শীগ গিরই ডাঙ্গার মুখ দেখতে পাব।"

কোন্ ভরসায় দেবকুমার ডাঙ্গার মুখ দেখবার আশা করছে জানিনা, তবে দৈবাৎ যদি কোনো জাহাজ আমাদের চোখে পড়ে তবে তাকে অনুসরণ করলেই আমরা কোনো না কোনো জায়গায় এসে পৌছাব—একথা আমরাও বিশ্বাস করি।

লাইট হাউস ছাড়িয়ে আমাদের উড়োজাহাজ উড়ে চল্ল অজানা অন্ধকারের মধ্যে।

উপরের অন্তহীন আকাশ, নীচের সীমাহীন জল এখন ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। জমাট আঁধার সমুদ্র যেন সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। তার ভিতর দিয়ে উড়ে চলেছে তিনটি অসহায় পথভ্রান্ত বাঙ্গালী যুবক। তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎও বোধ হয় এই রকম ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

এতক্ষণ আকাশের তারা দেখা যাচ্ছিল। এইবার গাঢ় কুয়াশার আড়ালে তারাও ধীরে ধীরে আত্ম-গোপন করতে লাগ্‌ল। তার উপর আবার ঝোড়ো হাওয়া বইতে আরম্ভ করে দিল।

—"একি একি! আমাদের এরোপ্লেন যে নীচে নেমে যাচ্ছে দেবকুমারবাবু,—কূলের সন্ধান পেলেন কি?" প্রায় একসঙ্গেই আমি আর বাহাদুর বলে উঠলাম।

উৎকন্ঠিত হয়ে দেবকুমার বল্লে—"বিগ্‌ড়ে গেছে, কল বিগড়ে গেছে,—আর বুঝি প্রাণে বাঁচতে পারলাম না। অতল সাগরেই বুঝি এবার সমাধি লাভ করতে হয়।"

ভাবলাম চীৎকার ক'রে কাঁদি, প্রাণপণে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠি,—কিন্তু গলা দিয়ে একটু অস্ফুট আর্ত্তনাদও বের হোলো না। কে যেন ভেতর থেকে জিভ টেনে ধরেছে। যদি জানতাম নীচে মাটি আছে তবে নিশ্চয়ই লাফিয়ে পড়ে' প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু নীচে যে দুরন্ত অতল সাগর, মৃত্যুর তরল রূপ।

বাহাদুরের অবস্থাও আমার মতন। সে নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বাক, নিস্পন্দ।

দেবকুমার তখনো কলের হাতল ঘুরাচ্ছে,—মৃত্যুকে জয় করবার সে কি অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

ঝড়ো বাতাসে ভাস্‌তে ভাস্‌তে আমাদের জাহাজ ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে চলেছে।

একবার সাহস ক'রে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লাম,—কিছুই দেখা গেল না, শুধু অন্ধকার, অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার।

এরোপ্লেন বেশ আস্তে আস্তে নাম্‌ছে, সাগরের জলে পড়তে আর বেশী দেরী নাই।

ঘটাং,—ঘট্‌......

একি,—এরোপ্লেন এসে পড়লো কোথায়? এতো সাগর নয়, এ যে কঠিন জমি।

আরে তাইতো...। মাটিতে পড়ামাত্র আবার অপ্রত্যাশিত ভাবে জাহাজের কলটা চল্‌তে আরম্ভ করল। দেবকুমার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কসে দিল।

আনন্দে যেন মাতাল হয়ে উঠলাম। দেবকুমার এক লাফে নীচে নেমে পড়ে' বল্লে—"অদ্ভুত, অদ্ভুত, সবই যেন রহস্যময় ব্যাপার, কোথায় সাগরের জলে ডুবে মরব,—না এসে হাজির একেবারে জমির উপর—একেবারে খাঁটি মাটির উপর।"

বাহাদুর উল্লাসে দিশেহারা হয়ে বল্লে—"আরো অদ্ভুত যে চোট পাইনি কোথাও একটুও, তোমার কি কোথাও আঘাত লেগেছে শঙ্কর?"

—"কোথাও না, কোথাও না,—একটা আঁচড় পর্য্যন্ত

লাগেনি। এ কোন্ দেশে এলাম দেবকুমার বাবু?"

—"তা তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, আজ রাতটা কাটুক—কাল ভোরে খোঁজ করা যাবে। জাহাজের কলটা আবার ঠিক হ'য়ে যাওয়ায় আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে।"

চৌদ্দ
নূতন বিপদ

বাকী রাতটা জেগেই কাটিয়ে দিলাম। এ কোন দেশে উড়ে এসে পড়েছি জানবার জন্যে আমাদের আগ্রহের সীমা নাই।

ভোরের আলো ফুট্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই চারিধারের দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

যে জায়গায় আমরা এসে পড়েছি তার এক পাশে একটা খাড়া উঁচু প্রাচীর একদিক থেকে আর এক দিকে চলে গেছে। অন্য দিকে নির্জ্জন অসমান মাঠ। অনেকটা পাহাড়ে-জায়গা বলেই বোধ হলো।

কিন্তু কোন্ দেশ এটা? জনমানবের কোনো সাড়া পাচ্ছি না,—বাড়ী ঘর কিম্বা সভ্য জাতির কোনো রকম কীর্ত্তি-কলাপের চিহ্নও চোখে পড়ছে না। শুধু একদিকে বিরাট এক প্রাচীর পাহাড়ের মত খাড়া হয়ে আছে। প্রাচীরের ওধারে যে কি, কোন রাজ্য—তাও ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছি না।

বল্লাম—"আমার মনে হয় আমরা কোনো রাজ্যের সীমান্তে এসে পৌঁছেছি। রাজ্যের শেষ প্রান্তের প্রাচীর বোধ হয় এটা। নিশ্চয়ই কোনো সভ্য জাতির এলাকায় আমরা এসেছি।"

বাহাদুর বল্লে—"আমারও তাই মনে হচ্ছে, প্রাচীরটাকে দেখলে মনে হয় বহুকালের,—কিন্তু তবু কেমন মজবুত ছাখো শঙ্কর।"

দেবকুমার বল্লে—"এই প্রাচীর বেয়ে আমাদের উপরে উঠ্‌তে হবে, এখান থেকে কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রাচীরটা যে রকম বিরাট এবং সুদীর্ঘ তাতে আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।"

—"কি সন্দেহ দেবকুমার বাবু,—কিছু আন্দাজ কর্‌তে পেরেছেন কি?" প্রায় এক সঙ্গেই আমি আর বাহাদুর জিজ্ঞাসা কর্‌লাম।

—"আমার মনে হচ্ছে—এটা সেই বিখ্যাত চীনের প্রাচীর।"

—"এ্যাঁ বলেন কি, আমরা কি চীন দেশে এসে পড়েছি?" আমি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বল্লাম।

বাহাদুরেরও কৌতূহলের শেষ নাই। বল্লে, "আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তবে আর বিশেষ ভয়ের কারণ নাই। চীন দেশ এখন যথেষ্ট সভ্য। আমাদের বিপদের কথা শুনলে তারা অবশ্যই আমাদের যথা-সম্ভব সাহায্য করবে।"

দেবকুমার বল্লে—"চীন দেশে ভালো লোক আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুর্দ্দান্ত চীনে দস্যুরও অভাব নাই। তারা অকারণে বিদেশী লোকের প্রাণ বধ করে, অনর্থক বিজাতীয় লোকের

সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। এই দুর্ব্বৃত্তদের হাতে পড়লে যথেষ্ট দুর্ভোগ আছে।”

একটু দূরেই আমাদের এরোপ্লেনটা পড়ে আছে। সেটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেবকুমার বল্লে—“যদি সোজা নীচে পড়তাম তবে আমরাও বাঁচতাম না, এরোপ্লেনটাও পড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত। কিন্তু বেঁচে গেছি আমরা ঐ ঝড়ো বাতাসের জন্যে। ঐ বাতাসই আমাদের উড়িয়ে ধীরে ধীরে এখানে এনে ফেলেছে। জাহাজেরও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। পরীক্ষা করে দেখলাম কলটা ঠিকই আছে—গরম হওয়ার দরুণ ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে গেছিল। যা হোক এখন আমাদের কোন লোকালয়ে যাওয়া নিতান্ত দরকার। সঙ্গের খাবারও সব ফুরিয়ে গেছে।”

আমরা ঠিক করলাম প্রাচীর বেয়ে উপরে উঠে—প্রাচীরের পথ ধ'রে কোনো লোকালয়ের দিকে হাঁটতে সুরু করব।

উপরের প্রাচীরের পথে অবশ্যই কোনো-না-কোনো লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। সম্পূর্ণ বিদেশী হলেও—ভাব-ভঙ্গীতে আমাদের বিপদের কথা তাদের বোঝাতে পারব।

দেবকুমার বল্লে—“যদি আমরা পিকিংয়ের কাছাকাছি কোনো জায়গায় এসে থাকি তবে খুব শীগ্‌গিরই আমরা এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাব। পিকিংয়ে নানা জাতীয় লোক

বাস করে—ভারতবাসীও যথেষ্ট আছে,—তাদের সাহায্য আমরা নিশ্চয়ই পাব।”

আমরা প্রাচীর বেয়ে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম।

অতি পুরাতন প্রাচীর, নানা জায়গায় ফাটল ধরেছে। সেই সব ফাটলে পা দিয়ে দিয়ে আমরা অতি সহজেই উপরের দিকে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম।

প্রায় উঠে পড়েছি—এমন সময় আতঙ্কে তিনজনেই আর্ত্তনাদ করে’ উঠ্‌লাম।

কারা যেন প্রাচীরের উপর থেকে হ্যাঁচকা টান মেরে আমাদের উপরে তুলে ফেল্ল। সেই টানের চোটে আমাদের গা হাত পা ছড়ে গেল, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়লাম!

—“হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ” উঃ—কী বিট্‌কেল শয়তানী হাসি,—সেই ভয়ঙ্কর হাসির চোটে আমাদের শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখ্‌লাম—বজ্রমুষ্ঠিতে আমাদের হাত ধরে’ সামনে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা দানব মূর্ত্তি। ঢুলু ঢুলু চোখ, চ্যাপ্‌টা নাক, উঁচু চোয়াল; চোখে মুখে তাদের সে কী দারুণ বীভৎসতার ছাপ!!

বুঝ্‌লাম চীনে দস্যুর হাতে পড়েছি আমরা।

এ কি ! কাটবে নাকি ! আমাদেরও কি এই পরিণাম ?...

-৬৭ পৃষ্ঠা

পনরো

দস্যুদের আস্তানায়

দড়ি দিয়ে সুদৃঢ় ভাবে আমাদের বেঁধে প্রাচীরের সুবিস্তৃত পথের উপর দিয়ে দস্যুর দল আমাদের টেনে নিয়ে চল্ল।

কিন্তু কী আমাদের অপরাধ? কোন্ ক্ষতিটা তাদের করেছি? এ বিষয়ে তাদের কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব তারও জো নেই, কারণ তাদের ভাষাও আমরা বুঝি না, তারাও আমাদের কথা বুঝ্‌তে পারে না।

এটা বেশ বুঝ্‌তে পারছি আমাদের পেয়ে তারা যেন বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। নিজেদের মধ্যে তারা যে সব কথা বল্‌ছে তাতেও যেন স্ফূর্ত্তি উথ্‌লে উঠ্‌ছে। তারা যেন শত্রুসেনা বন্দী করে' বিজয়ী বীরের মত পথ হাঁট্‌ছে।

আমাদের তিনজনের মুখে কোনো কথা নাই। কী কথাই বা থাকবে? ঐ ভীষণ হিংস্র চীনাদস্যুর হাত থেকে যে উদ্ধার পাবার কোনো চেষ্টা করব তাও সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ভালো করে তাকিয়ে দেখ্‌লাম লোকগুলির হাতের নখ গুলি মারাত্মক রকমের দীর্ঘ এবং তীক্ষ্ণ। ঐ নখের খোঁচা যদি কোনো রকমে গায়ে লাগে তবে চামড়া ফুটো হয়ে হাড়ে গিয়ে বিঁধ্‌বে।

দেবকুমারের কথাই দেখছি ঠিক। সে বলেছিল—দুর্দ্দান্ত

চীনে দস্যুরা অকারণে বিদেশী লোকের প্রাণ বধ করে,—অনর্থক বিজাতীয় লোকের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। আমাদের বরাতে কি আছে কে জানে! নিজেদের পরিণামের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে জীবন্মৃতের মত ওদের সাথে সাথে চলেছি।

কিছুটা পথ আসার পর দেখ্‌লাম প্রাচীরের একদিকে নামবার সিঁড়ি রয়েছে। ঐ সিঁড়ি দিয়ে দস্যুরা আমাদের নিয়ে নীচে নেমে এলো।

আমরা এইবার এই সুদীর্ঘ প্রাচীরের অপর দিকে এসে পড়েছি। এদিকের জমি আরো বেশী অসমতল, চড়াই, উৎরাইয়ে ভর্ত্তি। একটা সরু পায়ে-হাঁটা পথ এই উঁচু নীচু জমির উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চোখের আড়ালে চলে গেছে।

একটা বাঁক ঘুরতেই চোখে পড়ল ধূ ধূ করছে বালির রাশি—যেন অন্তহীন বালির সমুদ্র। মনটা ছ্যাঁৎ করে' উঠ্‌ল। এই কি চীনের সুবিখ্যাত গোবী মরুভূমি? কোথায় নিয়ে চলেছে এরা? কি উদ্দেশ্য এদের?

মরুভূমির ধার দিয়ে দিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর চোখে পড়ল ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী সগর্ব্বে সমুন্নত শিরে আমাদের পথ রোধ করে' দাঁড়িয়ে আছে। তার মাঝে ছোট বড় অজস্র গুহা।

এইখানে এসে আমরা থামলাম। দস্যুদের একজন হাত-

তালি দিয়ে বিকট চীৎকার করে উঠ্‌ল "হোয়া হোয়াং হোয়া।"
সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দস্যুগুলি মুখের মধ্যে আঙ্গুল পুরে
এক রকম অদ্ভুত কর্কশ আওয়াজ করতে লাগ্‌ল।

এ আবার কিসের সঙ্কেত ?

সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের গুহা গুলির ভিতর
থেকেও মনে হোলো কারা যেন ঐ রকম উদ্ভট শব্দ করছে,—
প্রত্যুত্তর দিচ্ছে !

চকিতের মধ্যে আরো কতকগুলি দস্যু ঐ অন্ধকার গিরি
কন্দর থেকে বের হয়ে আমাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল, এদের
চেহারা যেন আরও ভয়ঙ্কর আরো কদর্য্য ।

দুই দলের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হোলো বুঝ্‌লাম না।
সবাই মিলে একটা গুহার মধ্যে আমাদের টেনে নিয়ে চল্ল।

নিজের মনের অবস্থার কথাটা একবার বাহাদুরকে জানাতে
গেলাম, অমনি একখানা বিরাশী শিক্কার চড় সজোরে আমার
গালে এসে পড়ল। বুঝ্‌লাম কথা বলা আমাদের বারণ।

দুর্ব্বল শরীর থর্ থর্ করে' কাঁপছে, ভয়ে আতঙ্কে মন
মুহ্যমান, চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা, বুদ্ধিশুদ্ধিও একেবারে
লোপ পাবার জোগাড়।

ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার গুহার পথ,—হেঁট হয়ে না চললে মাথায়
চোট খাবার সম্ভাবনা। তিনজনের মাথাই অনেকবার ঠুকে
গেছে,—বেদনায় মাথা টন্ টন্ করছে।

অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে কিছুদূর যাবার পর আবার যেন আলোর রাজ্যে এসে পৌঁছুলাম। তাকিয়ে দেখি এক গুপ্ত পুরীতে এসে হাজীর হয়েছি।

একটি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট খুপ্‌রী-ঘর পাথর কেটে সুকৌশলে রচনা করা হয়েছে।

প্রাঙ্গণের একধারে উঁচু এক বেদী—তার উপর বসে আছে মূল্যবান পোষাক পরিহিত এক অদ্ভুত মূর্ত্তি। নাক তার নাই বল্লেও চলে, চোখ দুটো কোটরগত, মাথার উপর সাবেকী চীনে ধরণের লম্বা বেনী—মুখের গোঁফ খুব পাত্‌লা হলেও অনেকখানি দীর্ঘ। মাথার তুলনায় দেহখানি অতিশয় স্থূল।

দস্যুদল আমাদের নিয়ে এই লোকটির সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে অতি অদ্ভুত প্রথায় তাকে অভিবাদন করলে। অনুমানে বুঝ্‌লাম লোকটি দস্যুদের দলপতি।

মুখে কোনো কথা না বলে' দলপতি হাত দিয়ে কি ইসারা করতে দস্যুদল আমাদের পাশের একটা খুপ্‌রি-ঘরে নিয়ে গেল, তারপর লোহার শিকল দিয়ে আমাদের বেঁধে—তারা আবার দলপতির কাছে গিয়ে মাথা নীচু করে' দাঁড়াল।

কলে-পড়া ইঁদুরের মত আমরা সেই ছোট্ট কুঠ্‌রীটার মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলাম।

ষোলো

গোপন গুহায়

দস্যুদের দলপতি আবার জানি কি ইঙ্গিত করতেই দুজন খুব বলিষ্ঠ লোক হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজন মানুষকে দলপতির সাম্‌নে এনে দাঁড় করাল।

লক্ষ্য করে' দেখ্‌লাম লোক দুটো সম্পূর্ণ বিদেশী। কিন্তু কোন্ দেশের লোক তারা ঠিক অনুমান করতে পারলাম না। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ রং ভাবনায় চিন্তায় যেন কালো হয়ে গেছে। হাতে পায়ে তাদের শিকল বাঁধা।

দলপতি আর একবার কি সঙ্কেত করতে—আর একজন দস্যু প্রায় তারই আকারের একটি ঝক্‌ঝকে খাঁড়া নিয়ে সেই বিদেশী লোক দুটির পিছনে এসে দাঁড়াল।

এ কি! কাট্‌বে নাকি? আমাদেরও কি এই পরিণাম? আর কিছু ভাবতে পারলাম না।

বাহাদুর অস্ফুট গোঙানির স্বরে বল্লে—"শঙ্কর..." তার গলার স্বর থর্ থর্ করে' কাঁপছিল, আর কোনো কথা বের হোলো না। আমিও কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। দেবকুমার কি ভাবছে জানি না—তারও কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

উঃ, চোখের সামনে কী দেখ্‌লাম! না দেখ্‌লেই যে ভালো হোতো…

দলপতির আর একটি নীরব ইসারায় ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং করে' সেই বিদেশী লোক দুটির মাথা নিমেষের মধ্যে ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। মাটিতে পড়েও কাটা-মুণ্ড দুটো শিউরে শিউরে উঠতে লাগল—ধড় দুটো ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল।

আর তাকাতে পারলাম না; আতঙ্কে, ভয়ে চোখ দুটো আপনা আপনিই বুজে গেল; সমস্ত হাতে পায়ে যেন খিল্‌ ধরে' গেল। মনে হোলো যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্প আরম্ভ হয়েছে, তাতে যেন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তুমুল তাণ্ডবে দুল্‌তে আরম্ভ করেছে। দিনের বেলা—চোখের সামনে নেমে এলো ঘন ঘোর অমাবস্যার অন্ধকার।

একি দেখছি? তারায় তারায় প্রলয়ঙ্কর ঠোকাঠুকি লেগেছে, আতঙ্ককর বেগে উল্কা খসে পড়ছে, ধূমকেতুর লেজে দাউ দাউ করে' ভয়ঙ্কর আগুন জ্বল্‌ছে,—একি স্বপ্ন দেখ্‌ছি নাকি? না, এ উন্মাদের অবস্থা, মস্তিষ্কের বিকার…, কিন্তু তবু জ্ঞান হারাই নাই।

ভাব্‌লাম একবার চীৎকার করে' ডাকি—"বাহাদুর, দেবকুমার!" কিন্তু কি যেন অদৃশ্য হাতে আমার টুঁটি চেপে ধরল।

এইবার বোধ হয় দলপতি আমাদের আনবার ইসারা

করবে। আমি প্রস্তুত, প্রস্তুত না হয়েই বা কি করি। একান্ত আন্তরিক ভাবে একবার ভগবানকে ডাকলাম, ভগবান্—এই বীভৎস পরিণামের আগেই আমার চেতনা লোপ করে' দাও, সজ্ঞানে যেন এই পৈশাচিক মৃত্যু বরণ করতে না হয়!

দলপতি উঠে দাঁড়াল, অজানা ভাষায় দলের লোকদের কি যেন বলতেই তারা সেই ধড় আর মুণ্ডু দুটো তুলে নিয়ে চলে গেল। দলপতিও বিদায় নিল।

আমাদের পাহারা দেবার জন্যে রইল অস্ত্রধারী একজন দস্যু।

যাক্, কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত। এখন তবে সদ্য সদ্য মরণ বরণ করতে হবে না।

বে-হুঁশের মতন তিনজনে পাশাপাশি পড়ে' আছি—এমন সময় ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে কে যেন বল্লে—"কেমন জব্দ!"

কথাটা শুনে আমরা তিনজনেই চম্‌কে উঠ্‌লাম। পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখি সেই অস্ত্রধারী দস্যুটা আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বোকার মত হাস্‌ছে।

বুঝলাম লোকটা একটু একটু ইংরাজী জানে। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি গজিয়ে উঠ্‌ল। ভাব্‌লাম এর সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলে' যদি এর সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারি তবে উদ্ধারের একটা উপায় হতে পারে। মনে হোলো লোকটা যেন বেজায় বোকা।

ধীরে ধীরে উঠে বস্‌লাম, ইংরাজীতে বল্লাম—"বাঃ, তুমি তো বেশ ইংরাজী বল্‌তে পার, শিখ্‌লে কোথায় ?"

"কল্‌কাতায়—"

"এঁ্যা, তুমি কল্‌কাতায় ছিলে নাকি, কল্‌কাতা যে আমাদের দেশ। কল্‌কাতায় কোথায় ছিলে, কতদিন আগে ?"

"চার পাঁচ বছর আগে, ধর্ম্মতলায় আমার একটা জুতোর দোকান ছিল। দোকানটা এখনো আছে, আমার ভাইপো চালায়।"

আমাদের কথা-বার্ত্তা শুনে বাহাদুর আর দেবকুমারও উঠে বসেছে। তারাও স্থরু করে দিল নানা প্রশ্ন। উদ্ধার পাবার একটা গোপন আশা তাদের প্রাণেও যেন উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল। জমাট অন্ধকারের মধ্যে তারাও যেন একটু ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে পেল। দেবকুমার ফিস্ ফিস্ করে বল্লে —"লোকটা একদম নীরেট, চেহারা দেখ্‌লে মনে হয় না ঘটে একটুও বুদ্ধি আছে।"

বাহাদুর তাকে বল্লে—"কোন্ দোকান, কি নাম দোকানের।"

—"চী সী ক্যাং"—দস্যু উত্তর দিল।

দেবকুমার বল্লে, "এঁ্যা, সে দোকান যে এখনো আছে, এই জুতো যে সেই দোকানের।" এই বলে সে মিথ্যে করে' তার পায়ের জুতো দস্যুকে দেখাল।

দস্যু যেন একটু খুসী হোলো। প্রসন্ন মুখে বল্লে—"আমার ভাই পো টিং সিং এখন সেই দোকানের মালিক।"

"এ্যাঁ, টিং সিং! সে যে আমার বিশেষ পরিচিত। তার একটা চিঠি নিয়েই তো আমি চীন দেশে এসেছিলাম। ডার্বির টিকিটে সে এবার বিশ লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়েছে!" দেবকুমার বল্লে।

দস্যুর মুখটা যেন বিস্ময়ে 'হাঁ' হয়ে উঠ্‌ল, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে বল্লে—"এ্যাঁ, বল কি? তারপর?"

—"তারপর আর কি। সে বেচারী মৃত্যুশয্যায়। টাকাগুলি সে চীন দেশে তার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ভাগ করে' দিতে চায়।"

দস্যুর নাক দিয়ে গরম গরম নিশ্বাস পড়তে লাগল, বল্লে —"তার আত্মীয়ের মধ্যে বিশেষ কেউ তো নেই, পিকিংয়ে দূর সম্পর্কীয় একজন মামা আছে, আর আমি আছি। টাকাটা তবে ন্যায়তঃ আমারই প্রাপ্য।"

দেবকুমার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লে—"আমি পিকিংয়ে বেড়াতে আস্‌ছি শুনে, টিং সিং চীনা সরকারকে দেবার জন্যে একখানা চিঠি আমার কাছে দিয়েছিল, টাকাটার একটা সুব্যবস্থা যাতে হয়।"

—"চিঠিটা কই?" উত্তেজনায় দস্যুর যেন বুকে হাঁফ ধরেছে।

দস্যুর যত আগ্রহ আর কৌতূহল বেড়ে উঠ্‌ছে, দেবকুমার ততই তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাচ্ছে।

বল্লে, "চিঠিটা কি আর পাওয়া যাবে, রয়েছে আমাদের সেই এরোপ্লেনে।"

দেবকুমার যে কৌশল অবলম্বন করেছে, দেখা যাক্ তার ফল কি দাঁড়ায়!

আমি বল্লাম, "তোমরা অনর্থক আমাদের বন্দী করেছ কেন?"

—"অনর্থক করব কেন, কাল তোমরা এরোপ্লেনের উপর থেকে গুলি করে' আমাদের কয়েকজনকে মেরেছ, তারই প্রতিশোধ নেওয়া হবে।"

আমরা যেন আকাশ থেকে পড়লাম। বল্লাম—"সে কী, আমরা তো কারুকে গুলি করে' মারি নাই। আমাদের সঙ্গে তো গুলি বারুদ কিছু ছিল না।"

বুঝ্‌লাম দস্যুদল ভুল করে' আমাদের পাকড়াও করেছে। অন্য কোনো উড়োজাহাজের যাত্রী বোধ হয় ওদের আক্রমণ করেছিল। আমাদের সঙ্গে এরোপ্লেন দেখে ওরা আমাদেরই সেই শত্রু ভেবে বন্দী করেছে।

কিন্তু বিশ্বাস করবে কে?

আবার জিজ্ঞাসা করলাম—"এক্ষুনি যে দুটি লোককে হত্যা করা হোলো, ওরা কারা?"

—"ওদের কাল মরুভূমির ধারে ধরেছি। ওরাও আমা-

দের কাল আক্রমণ করেছিল। আমাদের দলের একজন লোকও ওদের হাতে মারা পড়েছে।”

“কোন জাতীয় লোক ওরা ?”

—“তা' জানি না।”

“কিন্তু আমরা তো তোমাদের কোন ক্ষতি করি নাই। তোমরা অনর্থক ভুল করেছ।” আমি বল্লাম।

দস্যু বল্লে—“কিন্তু আমাদের দলপতি সে কথা বিশ্বাস করবে না।”

—“দলপতি গেল কোথায় ?”

—“দলপতি নিজের বাড়ীতে গেছে এখন বিশ্রাম করতে, এখান থেকে কিছু দূরে একটা গ্রামে তার বাড়ী। কাল সকালে আবার আসবে, তারপর তার সামনে তোমাদের হত্যা করা হবে।”

“অন্যান্য দস্যুদল গেল কোথায় ?” বাহাদুর প্রশ্ন করলে।

“তারা সবাই আবার দলপতির হুকুমে লুটপাট্ করতে নানাদিকে গেছে, সন্ধ্যাবেলায় ফিরবে।”

দেবকুমার বল্লে—“এদিকে বৃষ্টি হয় না ?”

দস্যু বল্লে—“হুঁ, প্রায়ই বৃষ্টি হয়।”

দেবকুমার নিশ্বাস ফেলে বল্লে—“আমি ভাব্ছি টিং সিংএর চিঠিটার কথা। বৃষ্টির জলে যদি চিঠিখানা নষ্ট হয়ে যায়, তবেই সব গেল। হায় বেচারা টিং সিং।”

—দস্যু বল্লে—"চিঠিখানা যে আমার দরকার।"

—"দরকার বল্লেই তো হবে না, চিঠিখানা তো আর উড়ে এসে তোমার হাতে পড়বে না। সেখানে যাওয়া দরকার।" দেবকুমার বল্লে।

—"কিন্তু—কোথায় তোমাদের এরোপ্লেন তাতো আমি জানি না, আমি তো তোমাদের ধরে' নিয়ে আসি নাই, বাড়ীতেই ছিলাম।"

চিঠিটার লোভ আর কিছুতেই দস্যুটা সামলাতে পারছে না। বিশ লক্ষ টাকা তো আর সোজা কথা নয়!

দস্যুটা যত আগ্রহ দেখাচ্ছে আমরা ততই তাচ্ছিল্য প্রকাশ করছি।

শেষকালে আর থাক্তে না পেরে দস্যু বল্লে—"চল, তোমাদের সেই এরোপ্লেনটার কাছে নিয়ে যাই, চিঠিটা আমার এক্ষুণি দরকার।"

সতের
বন্দীর ফন্দী

চীনা দস্যুটা আমাদের নিয়ে অতি গোপনে আবার সেই পাঁচীলের ধারে এসে হাজীর।

গোপনে নিয়ে এলো তার কারণ হচ্ছে—অন্যান্য দস্যুরা যদি দেখতে পায় তবে আর রক্ষা থাক্‌বে না। আমরা পলাতক বন্দী,—আমাদের তো ধরবেই, আমাদের এই সঙ্গী দস্যুটার অবস্থাও হবে শোচনীয়।

এই চীনা দস্যুরা ক্ষমা ব'লে কোনো জিনিষ জানেনা। যে কোনো অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড। দলের লোকও যদি কোনো অন্যায় কাজ করে তারও মার্জ্জনা নাই—কোনো বিচার নাই। মায়া মমতার কোনো ধার এরা ধারে না।

পথ চল্‌তে চল্‌তে ভয়ে আমাদের বুক্ ধুক্ ধুক্ করছিল। কোনো রকমে যদি এই দুর্দ্দান্ত দস্যুদের আবার নজরে পড়ে যাই তবে সদ্য সদ্য মৃত্যু।

চীনা দস্যুটার কাছে শুন্‌লাম, নানা রকম ভাবে এরা শত্রুকে হত্যা করে। সব থেকে সোজা উপায় হচ্ছে,—এক কোপে গলা কেটে ফেলা। চোখের সাম্‌নে কিছুক্ষণ আগে যা আমরা দেখলাম, সেটাই হচ্ছে সব চেয়ে কম কষ্টদায়ক হত্যা। কোনো শত্রুর প্রতি দলপতির কিছু দয়া দেখাতে হলে

এই ভাবে হত্যা করা হয়।

জ্যান্ত আগুনে পুড়িয়ে; জীবন্ত অবস্থায় শরীরের ছাল ছাড়িয়ে, রুটি 'টোষ্ট' করার মত ঝলসিয়ে, ডিমের মত সিদ্ধ করে',—লোহার ডাণ্ডা দিয়ে সমস্ত শরীর হালুয়ার মত থেঁত্‌লে নানা ভাবে এরা শত্রুকে হত্যা করে।

কিন্তু সবচেয়ে লোমহর্ষণ ভাবে হত্যা হচ্ছে—লিং চিং।

শরীরের এক এক অংশ টুক্‌রো টুক্‌রো করে' কাটে,—আর তাতে তপ্ত নুন ছিটিয়ে ছিটিয়ে দ্যায়। এই রকম করে ১০৮ টুক্‌রো করে' শত্রুকে কাটা হয়। ১০৭ টুক্‌রো কাটা পর্য্যন্ত লোকটাকে কোনো রকমে বাঁচিয়ে রাখা হয়,—তারপর হৃৎপিণ্ডে একটা ভোঁতা ছোরা বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে তাকে খতম করে।

এটা হচ্ছে পলাতক বন্দীর সাজা। ফেরারী আসামীকে ধরতে পারলে এরা এই ভাবে হত্যা করে।

কাজেই আমরা যদি এই পালাবার সময় কোনো রকমে দস্যুদের নজরে পড়ে যাই, তবে ভাগ্যে কি ঘট্‌বে সহজেই অনুমান করা যায়।

সৌভাগ্যের বিষয় আমরা নিরাপদেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছালাম।

কিছুদূরেই এরোপ্লেনটা মাঠের মাঝে পড়ে ছিল। চারিধারে তাকিয়ে দেখলাম,—ধূ ধূ করছে জনমানবহীন মাঠ।

দিগন্ত রেখায় ঝাপ্‌সা মতন দেখা যাচ্ছে গগনস্পর্শী ধূম্র পাহাড়ের শ্রেণী।

চীনা দস্যুটা আর যেন থাক্‌তে পারছে না, চিঠির লোভ আর কিছুতেই সাম্‌লাতে পারছে না। এই চিঠির জন্যেই সে এত বড় দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

দেবকুমার চিঠি খুঁজবার ছল্‌ করে' একবার জাহাজের কল্‌টি পরীক্ষা করে নিল তারপর ইসারা করে' আমাদের চট্‌পট্‌ প্লেনে উঠে বস্‌তে বল্লে।

আমরা যেই উঠে বস্‌লাম অমনি বোঁ বোঁ করে উড়ো জাহাজ আমাদের নিয়ে শূন্যে উঠে গেল।

শুন্‌তে পেলাম চীনা দস্যুটা চীৎকার করে' বলছে—"কই —আমার চিঠি?"

দেবকুমার গলা বার করে' বল্লে—"কিসের চিঠি?"

দস্যু উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লে—"টিং সিং—"

আমি চেঁচিয়ে উত্তর দিলাম "লিং চিং।"

আঠার
আবার বিপদ

চীনের প্রাচীরকে লক্ষ্য করে' দেবকুমার পূর্ণবেগে উড়ো জাহাজ চালিয়ে দিল।

দু' হাজার বছর আগে চীন সম্রাট চিহোয়াংটি তাতারদের আক্রমণ থেকে তাঁর রাজ্য রক্ষা করবার জন্যে এই প্রাচীর তৈরী করেছিলেন। তাতাররা ছিল অতি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির দস্যু।

এই প্রাচীর পঁচিশ ফুট উঁচু আর লম্বায় প্রায় পনেরো শ' মাইল। মধ্যে মধ্যে আছে প্রায় হাজারটি মজ্‌বুত স্তম্ভ।

দশ হাজার লোক বারো বছর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে' এই প্রাচীরটি তৈরি করেছিল।

উড়োজাহাজে উড়তে উড়তে আমরা নীচের দিকে এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীরটি দেখ্‌তে দেখতে চলেছি।

কত পাহাড়, কত নদ নদী, বন জঙ্গল ভেদ করে' এই প্রাচীরটি দূর হতে দূরান্তরে চলে গেছে।

যে অদ্ভুত উপায়ে আজ দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি তা কেউ কোনো দিন ধারণা করতে পারে না, আমরাও পারি না।

এত সহজেই যে বোকা লোকটাকে দিয়ে কার্য্য-উদ্ধার

করতে পারব—তা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নাই। এতদিনে বুঝ্‌তে পারলাম দুনিয়ায় বোকা লোকেরও দরকার আছে।

ঠিক প্রাচীরের রেখা লক্ষ্য করে' করে' দেবকুমার এরোপ্লেন চালাচ্ছে। সূর্য্য প্রায় মাথার উপর।

আমাদের বিশ্বাস এই প্রাচীর ধরে' ধরে' গেলে নিশ্চয়ই আমরা কোনো সহরে এসে পৌঁছাব। সহরে পৌঁছাতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত।

আমি বাহাদুরকে বল্লাম—"বাহাদুর,—দেবকুমার বাবুর কৌশলটা অদ্ভুত রকমে ফলে গেছে,—না হলে কিছুতেই আর ঐ শয়তানদের ঘাঁটি থেকে উদ্ধার পেতাম না।"

এরোপ্লেন চালাতে চালাতেই দেবকুমার বল্লে—"সাধারণতঃ দস্যুরা খুব অর্থপিশাচ হয়। অর্থের জন্যেই এরা দস্যুবৃত্তি করে। কেবলমাত্র টাকার লোভ দেখিয়েই এদের বশ করা যায়। তাই ফন্দি করে'অর্থের লোভ দেখিয়ে বোকা লোকটাকে বশ করব ভাব্‌লাম। সত্য সত্যই মত্‌লবটা একেবারে খেটে গেল।"

—বাহাদুর বল্লে—"আহা লোকটার জন্যে দুঃখ হচ্ছে, বেচারা সরল বিশ্বাসে বড় কঠিন দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়েছিল। এখন যদি ওর কীর্ত্তি প্রকাশ পায় তা হলে ওর আর পরিত্রাণ নাই।"

—"কীর্ত্তি ওর প্রকাশ পাবেই, ওর উপরেই আমাদের

পাহারা দেবার ভার ছিল, ওর সাহায্যেই আমরা পালিয়েছি। দলপতি একথা যখন জানবে—তখন—”

বাহাদুর আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লে—“লিং চিং।”

ওঃ, সে কথা ভাব্‌তেও শরীরের রক্ত জল হয়ে যায়।

নীচে প্রাচীরের ধার দিয়ে খরস্রোতা একটা নদী এঁকে বেঁকে চলে গেছে।

ভালো করে' চেয়ে দেখলাম—নদীটি কূলে কূলে পূর্ণ ;—তার মৃদু কুলু্‌ কুলু্‌ ধ্বনি আমাদের কাণে এসে পৌঁছাতে লাগ্‌ল। বিখ্যাত হোয়াং-হো নদী এটা।

ঠিক নদীর উপর আমাদের এরোপ্লেন ; আড়াআড়ি ভাবে তাড়াতাড়ি নদীটা পার হচ্ছি—এমন সময়ে ঐ যাঃ—

জাহাজের সামনের ঘুরন্ত চাকাটা ভেঙ্গে নীচে পড়ে গেল——আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজন এরোপ্লেন শুদ্ধ ঝুপ্‌ করে' মাঝ দরিয়ায় পড়ে গেলাম।

একটা বিপদ কাটতে না কাটতেই আর একটা বিপদ,—মনটা বেজায় রকম দমে গেল। ভাগ্যিস জলের উপর পড়েছি তাই রক্ষা—পাথুরে জমির উপর পড়লে এতক্ষণ হাড় গোড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত।

একদিকের তীর ভালো মত চোখে পড়্‌ছে' না ; আর একদিকে ঝাপসা মতন ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে।

তিন জনেই পাকা সাঁতারু—কিন্তু আমাদের সাধ্য কি ঐ

জলের স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটে তীরের দিকে যাই।

কিছুক্ষণ চেষ্টা ক'রে হয়রাণ হ'য়ে অগত্যা স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে দিলাম। প্রবল স্রোতের টানে আমরা কোথায় ভেসে চল্লাম জানি না।

এরোপ্লেনটাও কিছুক্ষণ ভেসে ভেসে আমাদের সঙ্গে আসছিল কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢেউয়ের তোড়ে অতল জলে তলিয়ে গেল।

দেবকুমার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"বাড়ী ফিরবার সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল হয়ে গেল।"

জলের খরস্রোতটা এতক্ষণ নদীর মাঝখান দিয়েই বয়ে চলেছিল, এবার মনে হোলো—স্রোতের গতি যেন তীরের দিকে। আমরা স্রোতের টানে ডাঙ্গার দিকেই যেতে লাগ্‌লাম।

কি আশ্চর্য্য—এত বড় নদী, কিন্তু জাহাজ, ষ্টীমার তো দূরের কথা—কোনো নৌকাও আমাদের চোখে পড়ছে না।

তীরের দিকেই ভেসে চলেছি। একটা বাঁকের মুখে নদীটা ঘুরে গেছে। একবার ফিরে তাকালাম, দেখলাম—দূরে—অতি দূরে সেই বিখ্যাত চীনের প্রাচীরটা অতীতের সাক্ষী-স্বরূপ তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ বাহাদুর চীৎকার ক'রে বলে উঠ্‌ল—"তাড়াতাড়ি

চল শঙ্কর, দেবকুমার বাবু একটু চট্‌পট্‌ তীরের দিকে চলুন।"

"কেন? কি ব্যাপার।" আমি আর দেবকুমার সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

—"বোধ হয় কুমীর তাড়া করেছে—আর রক্ষা নাই।"

উনিশ

অন্তরঙ্গ বন্ধু

নদীটা বাঁকের মুখে ঘুরে গেছে। ডাঙ্গার খুব কাছাকাছি আমরা এসে পড়েছি, এমন সময় বাহাদুর কুমীরের আগমনের শুভসংবাদ দিল।

হ্যাঁ শুভসংবাদ বই কি! এই রকম ভাবে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রাম করার চেয়ে একেবারে কুমীরের পেটে গিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া ঢের ভালো।

যদি সত্যিই কুমীর এসে থাকে তবেই বা বাঁচবার কি উপায়? ঐ তো একটু দূরেই তীর দেখা যাচ্ছে, কিন্তু হাত পা যে অসাড়, ইচ্ছে থাক্‌লেও আর সাঁতার কাট্‌বার সামর্থ্য নাই। কোনো রকমে জড় পিণ্ডের মত ভেসে চলেছি। তিন জনেরই প্রায় একই অবস্থা।

দেবকুমার আগে, তারপর আমি, পিছনে বাহাদুর। প্রতি মুহূর্ত্তেই কুমীরের হাতে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি।

কিন্তু কই কুমীর। এখন পর্য্যন্ত তো তিনজনই অক্ষত শরীরে বর্ত্তমান আছি। বাহাদুর কি তবে ভুল সন্দেহ করেছে?

অকস্মাৎ আমাদের পিছনে কিছুদূরে প্রবল ঝটপটানির শব্দ শুনে চম্‌কে উঠ্‌লাম। মনে হোলো যেন জলের মধ্যে

ভীষণ একটা সংগ্রাম চলেছে, জল তোলপাড় করে' কে যেন তুমুল কাণ্ড বাধিয়েছে।

এ কি ব্যাপার? দুটো কুমীরে কি তবে ঝগড়া বেধেছে?

প্রায় ডাঙ্গার কাছে এসে পড়েছি। ঠিক তীরের ধারে একটা ঝাঁকড়া গাছের একটা নুয়ে-পড়া ডাল দেখতে পেয়ে আমরা তিনজনেই প্রাণপণ চেষ্টায় সাঁতার কেটে' কাছে গিয়ে সেই ডাল ধরে' চট্ করে ডাঙ্গায় উঠে পড়লাম।

চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল একটা রহস্য-পূর্ণ দৃশ্য।

একবার উপরে ভেসে উঠ্‌ছে একটা বিশাল কুমীরের শরীরের আধখানা, পরক্ষণেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আর একটা জানোয়ারের আধ-ডুবন্ত দেহ। কিন্তু কি জন্তু ওটা? মনে হচ্ছে, ঐ অজানা জানোয়ারটা—কুমীরের অর্দ্ধেক শরীর গিলে ফেলেছে, আর তার হাত হতে উদ্ধার পাবার জন্যে কুমীরটা প্রাণান্তকর চেষ্টা করছে।

—"একি ব্যাপার বাহাদুর,—কুমীরটাকে গিল্ল কে? কোন্ রাক্ষুসে জানোয়ার ওটা?" আমি অদম্য কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম।

—বাহাদুর তখনো দাঁড়িয়ে এই ব্যাপারটা দেখছে,— তারও ধাঁধা লেগেছে।

দেবকুমার বল্লে—"এতক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা গেছে,

কুমীরকে কোনো জানোয়ার গিলে নাই,—আমাদের সেই এরোপ্লেনের ভিতর কুমীরের মাথাটা আটকে গেছে ?"

—এঁ্যা—তাই নাকি ? আরে তাই তো,—ঐ তো সেই বহু-পরিচিত এরোপ্লেন খানা। ইস্, তবে কি এতক্ষণ স্রোতের টানে জাহাজ খানা আমাদের পিছনে পিছনে এসেছে ?

দেবকুমারের চোখ ছলছলিয়ে এলো ; বল্লে, "আপদে বিপদে, সময়ে, অসময়ে—এই এরোপ্লেন খানা কত ভাবে আমাদের রক্ষা করেছে। অকেজো বলে তাকে আমরা ত্যাগ করেছিলাম, কিন্তু সে আমাদের ছাড়তে পারে নাই। একান্ত বন্ধুর মত, নিতান্ত অনুগতের মত নিঃশব্দে, অজানিত ভাবে আমাদের পিছনে পিছনে এসে আজ সদ্য-মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়ে সে তার শেষ কর্ত্তব্য সম্পাদন করল। ঐ, ঐ,—কুমীরটাকে নিয়ে সে গভীর জলে ডুবে গেল।"

দেবকুমারের কথায়—আমাদেরও চোখের পাতা ভিজে এল। মনে হোলো বাস্তবিকই যেন আজ আমরা একজন পরম হিতৈষী অন্তরঙ্গ বন্ধুকে হারালাম।

আলের পথে

অলৌকিক ভাবে কুমীরের হাত থেকে তো বাঁচা গেল—

এখন যাই কোথায় ? সমস্ত শরীর ভিজে একেবারে চুপ চুপে হয়ে গেছে,—তার উপর বইছে শিরশিরিয়ে শীতের হাওয়া। অন্য সময় হোলে আমরা কেঁপে অস্থির হতাম, কিন্তু অনবরত উত্তেজনা ও উন্মাদনার ভিতর দিয়ে সময় কাট্‌ছে বলে— শীতের অনুভূতি আর নাই।

জামা কাপড়গুলো ভালো করে' নিংড়ে ফেলে বল্লাম "এখন যাওয়া যায় কোথায় ?"

বাহাদুর বল্লে—"দূর মাঠে ধানের ক্ষেতের মতন কি যেন দেখা যাচ্ছে, চল ঐ দিকে যাই। ক্ষেত যদি হয়— তবে নিশ্চয় আলের পথও পাওয়া যাবে। ঐ পথ ধরে' গেলে নিশ্চয়ই আমরা লোকালয়ে পৌঁছাব।"

দেবকুমার বল্লে—"ধানের ক্ষেত বলেই মনে হচ্ছে, বাঙ্গালীর মত ভাতই চীনাদের প্রধান খাদ্য।"

ধান ক্ষেত লক্ষ্য করে আমরা চলতে লাগ্‌লাম।

বেলা প্রায় পড়ে এসেছে,—পড়ন্ত রোদের লাল্‌চে আভায় হোয়াং হো নদীর রূপালী জল যেন সোনালী স্বপ্নে বুঁদ হয়ে উঠ্‌ল।

মাঠের মাঝে মাঝে নানা রকম গাছ পালা। পাখীর কোলাহলে সেইসব গাছ মুখরিত। মনে হচ্ছে না—আমরা কোনো সুদূর বিদেশে—অজানা পথ ধরে চলেছি। এ যে ঠিক আমাদের দেশেরই মতন।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ঠিক বাংলা দেশের মতই সারবেঁধে এক ঝাঁক বক উড়ে চলেছে। কয়েকটা কাকও আমাদের চোখে পড়ল, ঠিক সেই রকম চিরপরিচিত স্বরেই ডাকছে।

এই তো সত্যিই ধানের ক্ষেত। নিশ্চয়ই ধারে কাছে কোনো গ্রাম আছে। আমাদের বিপদের কথা বুঝলে নিশ্চয়ই গ্রামবাসীরা আমাদের আশ্রয় দেবে, সাহায্য করবে।

ক্ষেতের মাঝ দিয়ে দিয়ে আলের পথ। সেই পথ দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। কারুর মুখে কোনো কথা নাই। এমন সময়ে মনে হোলো আমাদের পাশের একদিকের ধানগাছ গুলি খুব নড়ছে। হাওয়ায় কাঁপছে নাকি? উঁহু, তবে তো সব গাছ গুলিই সমান ভাবে নড়বে, তা ছাড়া হাওয়ার জোরও তো এখন তেমন নেই।

বাহাদুর চাপা গলায় বল্লে—"শুয়োর টুয়োর হবে বোধ হয়, ক্ষেতের মধ্যে কাদা ঘাঁটছে।"

হঠাৎ ধানগাছ গুলো একটু ফাঁক হয়ে গেল। সেই দিকে নজর পড়তেই আমরা থমকে দাঁড়ালাম,—দেখলাম

একজন 'চীনাম্যান' একটা প্রকাণ্ড থলির মুখের বাঁধন খুলছে।

এঁ্যা, চোর না ডাকাত? নিশ্চয়ই, চোরাই মাল নিয়ে এখানে এসে আত্মগোপন করেছে।

—"এস সট্‌কে পড়ি বাহাদুর,—আমাদের দেখতে পেলে কিন্তু তেড়ে আসতে পারে।"—আমি সভয়ে বল্লাম!

দেবকুমার বল্লে—"চোরের মন এখন বোঁচকার দিকে, আমাদের টের পাবে না, আর যদিই বা পায় ভয়ের এমন কিছু কারণ নাই, আমরা তিন জন, আর ও একা। সাহস করবে না কিছু করতে।"

দেখ্‌তে দেখতে লোকটা থলির মুখ খুলে ফেল্ল।

মস্ত বড় থলিটা। অনেক টাকা পয়সা, গয়নাগাটি, বাসন-কোসন নিশ্চয়ই ওর ভিতরে আছে।

—সর্ব্বনাশ!! আমরা তিনজনেই শিউরে উঠ্‌লাম একসঙ্গে।

মুণ্ডুহীন একটা ধড়, গর্দ্দানে তাজা রক্ত থক্ থক্ করছে।

খুন, খুন, খুন! লোকটা কারুকে খুন করে গোপনে এখানে এনে কাদায় পুঁতে রাখ্‌ছে।

দেবকুমার বল্লে "আর এখানে এক মুহূর্ত্তও দেরী করা উচিত নয়, চলুন পালাই। লোকটা খুনে, টের পেলে আমাদের আক্রমণ করতে পারে। হয়তো খুনের দায়টাও আমাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিতে পারে।"

লম্বা লম্বা পা ফেলে আমরা আবার এগিয়ে চল্লাম।

একুশ

সম্মানিত অতিথি

সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে আমরা ধানক্ষেত ছাড়িয়ে একটা মাঠের প্রান্তে এসে উপস্থিত।

মনে হোলো—দূরে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে যেন মিট্ মিট্ ক'রে আলো জ্বলছে।

নিশ্চয় ওটা কোনো লোকালয়,—না হলে বাতি জ্বলবে কেন ?

আশায় উৎফুল্ল হয়ে সেই আলো লক্ষ্য করে' করে' আমরা চল্‌তে আরম্ভ করে' দিলাম।

হ্যাঁ, ঠিকই তো, ঐ তো একটা বাড়ী দেখা যাচ্ছে,—টিনের চাল, চীনের বাড়ী। ঠিক এই রকম চীনে ধরণের বাড়ী আমরা ছবিতে দেখেছি।

দেবকুমার বল্লে—"আমরা বিদেশী, আমাদের কথা ওরা বুঝ্‌বে না। ভাব ভঙ্গীতে আমাদের বিপদের কথা ওদের জানাতে হবে।

বাহাদুর বল্লে—"জাপানী ভাষা আমি কিছু কিছু জানি,—আমার মনে হয় চীনেরা জাপানী ভাষা বোধ হয় বুঝ্‌তে পারে।"

আমি বল্লাম—"সেটা হয়ত সম্ভব। বাঙ্গালীদের প্রায়

সকলেই হিন্দী কথা বুঝ্‌তে পারে, চীনেরা কি আর তাদের প্রতিবেশী জাপানীদের কথা বুঝ্‌তে পারবে না ?"

যাই হোক চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি।

ছোট্টখাট্ট একটি কাফি-খানা, হোটেলও বলা যেতে পারে। ঘরের ভিতর একটা টেবিলের দুই দিকে বসে কয়েকটি চীনে লোক পেয়ালা করে' কি জানি খাচ্ছিল, বোধ হয় চা কিম্বা কাফি।

দরজার সাম্‌নে তিন জন অপরিচিত বিদেশী মানুষ দেখে একটি লোক উৎসুক নেত্রে আমাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। বোধ হয় দোকানের মালিক।

বাহাদুর জাপানী ভাষায় বল্লে "আমরা তিনজন বিপন্ন ভারতবাসী। তোমাদের আশ্রয়-প্রার্থী, দয়া করে' যদি আজ রাতের মত একটু স্থান আর খাবারের ব্যবস্থা করে' দাও তবে চির কৃতজ্ঞ হব।"

লোকটি বেশ জাপানী ভাষা জানে। সে বাহাদুরকে যা বল্লে তার অর্থ হচ্ছে—"চীনদেশের লোক অতিথিকে দেবতার মত জ্ঞান করে। বিদেশী হোক, দেশবাসী হোক, বন্ধু হোক্, শত্রু হোক্—যে বিপন্ন, আশ্রয়প্রার্থী—তাকে সাহায্য করা আমাদের প্রধান ধর্ম্ম। তোমরা ভগবান বুদ্ধদেবের দেশের লোক,—তোমাদের আশ্রয় না দিলে ভগবান তথাগতের কাছে আমরা অপরাধী হব।"

বাহাদুরের কাছ থেকে লোকটির কথার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পেরে আমি আনন্দে কেঁদে ফেল্লাম। আজ কতদিন—এই রকম করুণার কথা শুনি নাই, এ রকম প্রাণবান হৃদয়ের পরিচয় পাই নাই। দেবকুমারের চোখও অশ্রু বাষ্পে ঝাপ্‌সা হয়ে উঠ্‌ল।

অতি সমাদরে আমাদের ভিতরে নিয়ে এসে লোকটি সসম্মানে আমাদের একটি ঘরে এনে বস্‌তে দিল। তারপর বাহাদুরকে জাপানী ভাষায় বল্লে, "পিকিং থেকে একজন ধনী জমিদার আজ সকালে এখানে এসে উঠেছিল। দুপুর বেলা থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আপনাদের এই ঘরেই তাকে থাক্‌তে দিয়েছিলাম। এই ঘর থেকেই সে অলৌকিক ভাবে অদৃশ্য হয়েছে। আমি বিশেষ একটা জরুরী কাজে সহরে যাচ্ছি। আজ রাত্রে আর ফিরতে পারব না। আমার সহকারী ফুংচুকে আমি আদেশ দিয়ে যাচ্ছি, সেই আপনাদের যথাযোগ্য আদর আপ্যায়ন করবে। দয়া করে আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।" এই বলে সে আমাদের অভিবাদন করে' চলে গেল।

ভাবতে লাগলাম কত প্রভেদ ঐ হিংস্র চীনা দস্যু আর এই হৃদয়বান চীনা ভদ্র লোকের মধ্যে। একজন নরকের পিশাচ, আর একজন স্বর্গের দেবতা।

দোকানের মালিক বিদায় নিয়ে চলে গেল। তার

সহকারী ফুংচু আমাদের খাবার আর শোবার ব্যবস্থা করে' দিল।

পেটপুরে মাংসের ঝোল আর ভাত খেয়ে আমরা খড়ের গদিতে হাত পা' ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। আঃ, কী আরাম। এ আরামের তুলনা দেওয়া যায় না, এ আনন্দের কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

ঘরখানা বেশ ছোট্ট। এক কোণে একটা তেপায়ার উপর মিট্ মিট্ করে' প্রদীপ জ্বলছে। নীচে মেঝের উপর পুরু করে' খড় বিছানো, তার উপর ফরাস পেতে গদি করা হয়েছে। সারা ঘরে একটি মাত্র জানালা। এটি একটি গ্রামের কাফি-খানা। আমাদের দেশের 'গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোডের' মত একটি রাজপথ এই দোকানের ধার দিয়ে সোজা পিকিনের দিকে চলে গেছে। তাই অনেক যাত্রী সহরের দিকে যাবার সময় পথশ্রান্ত হয়ে এই দোকানে আশ্রয় নেয়, বিশ্রাম করে' যায়। অনেক ধনীও মাঝে মাঝে এখানে এসে—চা, কাফি খেয়ে যায়, পথের ক্লান্তি লাঘব করে যায়।

মৌতাতের ব্যবস্থাও আছে। তাই অনেক দুর্ব্বৃত্ত, শয়তানের দল নিরিবিলিতে আফিং, কোকেনের নেশা জমাতে এখানে যে জমায়েৎ না হয় তা নয়।

গভীর রাত্রি। সমস্ত দোকানটা এখন নীরব নিস্তব্ধ।

পাশের ঘরে যে কয়জন লোক গল্প করতে করতে চা খাচ্ছিল তারাও একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

পায়ের কাছের জানালাটা খোলা তাই দিয়ে ফুর ফুর করে' শীতের হাওয়া ঘরে ঢুক্‌ছে। ফুংচুর দেওয়া একটা গরম চাদর গায়ে দিয়ে আমরা শুয়ে শুয়ে গল্প করছি।

বাইশ

ঘোর ফ্যাসাদ

তিন জনেই গাঢ় ঘুমে অচেতন,—এমন সময়ে—দুরুম দুরুম্ করে' দরজায় ভয়ঙ্কর ভাবে কারা জানি আঘাত করতে লাগ্‌ল।

সেই শব্দে আমাদের তিন জনেরই ঘুম গেল ভেঙ্গে। জানালার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লাম প্রায় ভোর হয়ে এসেছে,—কিন্তু সূর্য্য উঠবার তখনো অনেক দেরী।

আঃ, অমন বিশ্রী অভদ্র ভাবে দরজা ধাকাচ্ছে কে? ভারী বিরক্ত হলাম। মনে হোলো অনেক লোক এক সঙ্গে মিলে যেন ঘরের বাইরে গোলমাল করছে, আর দরজায় ঘা মারছে।

দেবকুমার এক লাফে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল—অমনি ঘরের ভিতর ঢুকল একদল চীনে পুলিশ।

কালকে যে সেই জমিদার এই ঘর থেকে রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়েছিলেন, তারই তদন্ত করতে এদের আগমন। বোধ হয় হোটেলের মালিক সহরে গিয়ে পুলিশকে এই খবর জানিয়েছে। সে কিন্তু সঙ্গে আস্‌তে পারে নাই।

পুলিশের দল ঘরে ঢুকে ওলোটপালোট করে' চারিধারে জিনিষ পত্র পরীক্ষা করতে লাগল, তাদের মধ্যে একজন যেই

খড়ের উপরের চাদরটা সরিয়েছে অমনি খড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা কাটামুণ্ডু। এই দৃশ্য দেখে আমাদের তো চক্ষু স্থির! রক্ত হিম হবার যোগাড়। ভূতুড়ে ব্যাপার নাকি? ফুংচু সনাক্ত করলে এটাই সেই জমিদারের মুণ্ডু। মুণ্ডুর সন্ধান পাওয়া গেল কিন্তু ধড় কৈ? খড়ের গাদার মধ্যে ধড়ের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না।

চীনে পুলিশ, তাদের কোনো কথাই আমরা বুঝ্‌তে পারলাম না; তারাও আমাদের ভাষা বুঝ্‌লনা। শুধু এইটুকু অনুমান করলাম তারা আমাদেরই খুনী বলে অনুমান করেছে।

তিন জনকে হাতে কড়া দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে তারা টেনে নিয়ে চল্ল সহরের দিকে।

হায়, যদি আজ কাফি-খানার সেই অতি-ভদ্রলোকটি এই সময়ে উপস্থিত থাকৃত তবে হয়ত আমরা এ রকম ভাবে অনর্থক ধরা পড়তাম না

আমরা চায়ের দোকানে আসার অনেক আগেই যে জমিদার অদৃশ্য হয়েছে সে কথা বুঝিয়ে বলব এমন সামর্থ্যও আমাদের নাই। চীনে ভাষাও আমরা জানি না, চীনে পুলিশরাও ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী কিম্বা জাপানী ভাষাও বোঝে না। কাজেই নির্দ্দোষ হয়েও আমরা আজ খুনী আসামী।

ফুংচুও যে বুদ্ধি করে' আমাদের হয়ে কিছু বলবে—তাও কিছু করল না। সে পুলিশ দেখে কেঁপেই অস্থির।

বরাতে আরো কি লেখা আছে কে জানে? বরাতকে মেনে চল্‌তেই হবে। এতদিন শুধু অদৃষ্টের জোরেই বেঁচে এসেছি, অবশ্য-মৃত্যুর হাত থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে রক্ষা পেয়েছি। দেখা যাক্ এবার কি হয়!

পথ চলতে চলতে বাহাদুর বল্লে, "সেই হোটেলের মালিক এখন উপস্থিত থাক্‌লে আসল খুনীর খবর কিছু তাকে জানাতে পারতাম।"

দেবকুমার আর আমি প্রায় একসঙ্গেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি রকম? খুনীর খবর তুমি জান্‌লে কি করে?"

—"আমি কেন, তোমরা সবাই জানো শঙ্কর, আপনিও জানেন দেবকুমার বাবু।"

আরে বাহাদুর বলে কি? ওর মাথা খারাপ হোলো নাকি? আমাদের আরো কোনো প্রশ্ন করবার আগেই বাহাদুর বল্লে—"ধানক্ষেতের ঝোপে সেই লোকটার কথা মনে পড়ছে? ঐ যে থলি খুলে একটা খড় বের করছিল।"

ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্। আর কোনো সন্দেহ নাই। ঐ লোকটাই খুনে, জমিদারকে ও-ই খুন করেছে।

কিন্তু উপায়? এখন যদি ওখানে পুলিশের দলকে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে তো আর ঐ খুনেটার পাত্তা পাওয়া যাবে না, খড়টা পাওয়া যেতে পারে। খড়টা পাওয়া গেলেও আমরা প্রমাণ করতে পারব না যে আমরা খুন করি নাই। বরং

আরো উল্টা ফল ফলবে। ধড়টা দেখে ওদের বিশ্বাস আরো-বদ্ধমূল হবে—যে নিশ্চয়ই এটা আমাদের কীর্ত্তি, না হলে এই নির্জ্জন স্থানে দেহটার খবর আমরা পেলাম কি করে?

পথ দিয়ে চলেছি, আর আমাদের পিছনে পিছনে চলেছে কাতারে কাতারে লোক। তিনজন বিদেশী গুণ্ডা এসে ওদের একজন স্বদেশবাসীকে হত্যা করেছে, কম কথা নয়। জনতার ভাষা বুঝ্‌ছি না—কিন্তু বেশ ধারণা করতে পারছি, আমাদের উদ্দেশ্য করে' ওরা নানা রকম ঠাট্টা, বিদ্রূপ করছে, গালাগালি দিচ্ছে, আমাদের কঠোর শাস্তি দেবার জন্যে পুলিশকে উত্তেজিত করছে।

তেইশ
খুনী আসামী

আমাদের বিচার শেষ হয়ে গেছে। তিনজনেই খুনী আসামী বলে প্রতিপন্ন হয়েছি। গলায় কাঠের এক রকম তক্তা পরে' হাজত বাস করছি। কাল খুব প্রত্যূষে আমাদের এই মর্ত্তলোকের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচে যাবে। কালই আমাদের মৃত্যুর দিন বলে বিচারালয় থেকে ধার্য্য করা হয়েছে।

আজকের এই প্রগাঢ় অন্ধকার রাতের মতই আমাদের ভবিষ্যৎটা অন্ধকার। আজ এই বাইশ বছর ধ'রে যে-পৃথিবীর সঙ্গে নিবিড় পরিচয়—পরম ঘনিষ্ঠতা, তাকে চিরজন্মের মত ত্যাগ করে' কোথায় যাব আমরা! শুনেছি পরলোক বলে একটা জায়গা আছে, পরকাল বলে একটা কথা আছে—কিন্তু কোথায় সে দেশ? কী সে জিনিষ?

পাশাপাশি তিনটি কুঠুরীতে আমরা তিনজন আলাদা আলাদা রয়েছি। ধীর স্থির ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি।

একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস!

সম্পূর্ণ নিরপরাধ হয়েও আজ আমরা খুনী আসামী বলে সাব্যস্ত। যাকে জীবনে কখনো দেখি নাই, যার কোনো পরিচয় জানি না, যে লোকের সঙ্গে শত্রুতা করা দূরে থাক্

সামান্য মুখের আলাপটুকু পর্য্যন্ত কোনো দিন ছিল না, তাকে খুন করেছি আমরা, অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া এ আর কি হ'তে পারে ? হায়, আজ সুদূর স্বদেশে আত্মীয় পরিজনরা আমাদের অবস্থার কথা কিছু ধারণা করতে পারছে কি ?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে চলেছে। মনে হচ্ছে যেন জেলের ঘড়িগুলি খুব দ্রুত বেজে চলেছে, সবাই যেন ষড়যন্ত্র করে' তাড়াতাড়ি আমাদের এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলতে চায়।

শেষ রাত্রে ঝপাং করে' লোহার দরজা খুলে গেল। এইবার—এইবার—এইবার······মনে হোলো চোখের সাম্‌নে যেন অসংখ্য ছায়ামূর্ত্তি নাচ্‌ছে,—উঃ, কী ভয়ঙ্কর তাদের চেহারা—এরাই কি যমদূত নাকি ?

চীনা প্রহরীরা আমাদের সেল থেকে বের করে নিয়ে চল্ল বধ্যভূমির দিকে। আমাদের তখনকার অবস্থা অবর্ণনীয়। তিনজন মুমূর্ষু বন্দী নীরবে চলেছি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে; চলার তালে তালে বাজ্‌ছে পায়ের শিকল, শরীর অচল, মন বিকল,—তবু চলেছি।

আমাদের দেশে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীকে ফাঁসি দিয়ে বধ করা হয়, কিন্তু এরা আমাদের কি ভাবে শেষ করবে কে জানে ? 'লিং চিং' করবে না তো ? যা-ই করুক,—মরতে যখন হবে তখন মিছে আর ভেবে লাভ কি ?

চীনা প্রহরীরা আমাদের সোজা নিয়ে এলো জেলের

আপিসে। তা হলে বোধহয় এখান থেকেই বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবে। আরে ওকে?

তাকিয়ে দেখলাম—জেলের আপিসে বসে আছে হাসি হাসি মুখে সেই হোটেলের মালিক।

ওঃ, কী ভণ্ড লোকটা! ও-ই বোধহয় আমাদের ধরিয়ে দিয়ে এখন মজা করে' মৃত্যুর কৌতুক উপভোগ করতে এসেছে।

কিন্তু একি? জাপানী ভাষায় লোকটি বাহাদুরকে বল্লে', —"আজ রাত্রি-শেষেই আপনাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে জান্‌তে পেরে,—আমি তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি। আসল খুনীকে পাওয়া গেছে। একটা ধান-ক্ষেতের মধ্যে থেকে জমিদারের লাশও উদ্ধার করা হয়েছে।—লোকটা একটা নামজাদা বদ্‌মাইস্‌। পুলিশ তাকে ধরেছে,—একটু দেরী হলেই হয়েছিল আর কি! ভগবান বুদ্ধ আপনাদের বাঁচিয়েছেন।"

আমাদের কারুর মুখে আর কথা নাই। একটু আগে যার উপর বিরক্তি আর ঘৃণায় অন্তর ভরে উঠেছিল,—এখন শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তার চরণে মাথা যেন লুটিয়ে পড়তে চাইছে। ওঃ, লোকটিকে ভণ্ড ভেবে আমরা কী অন্যায়ই করেছি।

সবই যেন হেঁয়ালী বলে মনে হচ্ছে,—মনে হচ্ছে কোনো এক অদৃশ্য শক্তি বোধহয় আমাদের নিয়ে একটু রসিকতা জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু তার তো রসিকতা—আমাদের যে প্রাণান্তকর অবস্থা।

পুলিশের প্রধান কর্ত্তা বেশ ভালো ইংরাজী জানে। সে অনুতপ্ত হয়ে বল্লে—"এই মারাত্মক ভুলের জন্য সমস্ত চীনা-সরকার দুঃখিত। যথাসময়ে যে সংবাদ পাওয়া গেছে তার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ। আর আধঘণ্টা দেরী হলেই আর শত চেষ্টা করলেও আপনাদের ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হোত না—মুক্তি দেবার কোনো উপায় থাক্‌ত না। ঐ দেখুন সব প্রস্তুত ছিল।" এই বলে পুলিশ কর্ম্মচারীটি আঙ্গুলের ইসারা করে' দেয়ালে ঝোলানো প্রকাণ্ড এক ঝক্‌ঝকে খাঁড়া আমাদের দেখিয়ে দিল।

আমরা তিনজনেই একবার সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী ভয়ঙ্কর খাঁড়াটার দিকে তাকালাম,—মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগ্‌ল, শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল।

চব্বিশ
সাংহাইয়ের পথে

মুক্তি লাভ করে' আমরা যখন জেল প্রাচীরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম তখন ভোর হয়ে এসেছে।

পুলিশ কর্ম্মচারীর মুখে শুনেছি সাংহাই সহরে কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করেন।

আমরা তিন জনে মিলে পরামর্শ করলাম—আমাদের এখন সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ঐ বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের খোঁজ করা। তাঁদের কাছে গিয়ে পড়তে পারলে আর কোনো চিন্তার কারণ থাকবে না।

দেবকুমার বল্লে—"যদি এরোপ্লেনটা এখন থাকত, তবে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই আমরা সাংহাইয়ে গিয়ে হাজির হতে পারতাম। পিকিন থেকে সাংহাইয়ের দূরত্ব অনেকখানি।"

বাহাদুর বল্লে—"এরোপ্লেন যখন নেই, তখন আর তার আলোচনা করে' লাভ কি। হেঁটেই আমাদের সাংহাইয়ের দিকে যেতে হবে। পয়সাকড়ি সঙ্গে থাকলেও না হয় অন্য ব্যবস্থা করা যেত।"

আমি বল্লাম—"জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিছু সাহায্য চাইলে বোধহয় পাওয়া যেত। অন্ততঃ তারা সাংহাই পর্য্যন্ত যাবার ব্যবস্থা বোধহয় নিশ্চয়ই করে' দিত।"

দেবকুমার বল্লে—"আসন্ন-মৃত্যুর হাত থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে রক্ষা পেয়ে আনন্দে এত আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম যে—ওসব কথা আর ভাব্‌বার সময় পাই নাই। যা হোক্,—আর ফিরে গিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করা যায় না। চলুন হেঁটেই যাওয়া যাক্।"

আমি বল্লাম—"যে সব ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের আস্‌তে হয়েছে, তার কাছে এই সামান্য পথ হাঁটাটুকু নেহাৎ ছেলেখেলা বলেই মনে হচ্ছে,—চলুন দেবকুমার বাবু, চল বাহাদুর।"

এই কয়দিন জেলে থেকে আমাদের খাবার দাবার অসুবিধা হয় নাই একটুও। বরঞ্চ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী বলে' আমাদের আহারের ব্যবস্থা অতি পরিপাটি রকমেরই হয়েছিল। জেল থেকে বিদায় দেবার সময়ও প্রচুর খাবারের আয়োজন করেছিল জেলের কর্ত্তৃপক্ষ।

কাজেই আপাততঃ সকলের পেটই বেশ ভরপূর ছিল। তার উপর সদ্য-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে মনে যেন নবীন উৎসাহ জেগে উঠল, শরীর যেন নব বলে বলীয়ান হয়ে উঠল।

পিকিন্ থেকে একটা সোজা সড়ক চীনের রাজধানী নান্‌কিন্ হয়ে সাংহাইয়ের দিকে চলে গেছে। সাংহাই একটা প্রকাণ্ড ব্যবসার আড্ডা। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের লোকই

দু'পয়সা রোজগারের আশায় এখানে এসে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে।

এই সড়ক ধরে' আমরা বিপুল উৎসাহে সাংহাইয়ের দিকে হাঁটতে সুরু করে' দিলাম।......

রাস্তাটি কত গ্রামের মধ্যে দিয়ে—কত নদীর ধার দিয়ে—কত পাহাড়ের পাশ দিয়ে—ঘুরে ঘুরে, দূরে দূরে চলে গেছে। আমরা একটানা ভাবে হেঁটে চলেছি, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই।

সূর্য্য তখন মাথার উপর। আমরা একটি গ্রামের ধারে এসে পৌঁছুলাম।

বিদেশী লোক ও অদ্ভুত পোষাক পরিচ্ছদ দেখে গ্রামের ছেলেমেয়েরা সকৌতুকে আমাদের দেখ্‌তে ছুটে এল।

একজন চীনে-বুড়ো প্রকাণ্ড একটা আফিংয়ের পাইপ মুখে দিয়ে ধোঁয়া বের করতে করতে আমাদের কাছে এসে চীনে ভাষায় কি যেন জিজ্ঞেস করল। আমরা কিছুই বুঝ্‌লাম না।

বাহাদুর জাপানী ভাষায় তাকে বল্লে—"আমরা বিপন্ন ভারতবাসী, সাংহাই চলেছি এই পথ ধরে।"

লোকটি জাপানী ভাষা বুঝ্‌ল। বল্লে—"এই পথ ধরে' সাংহাই গেলে এক সপ্তাহেও পৌছাতে পারবে না,—আর
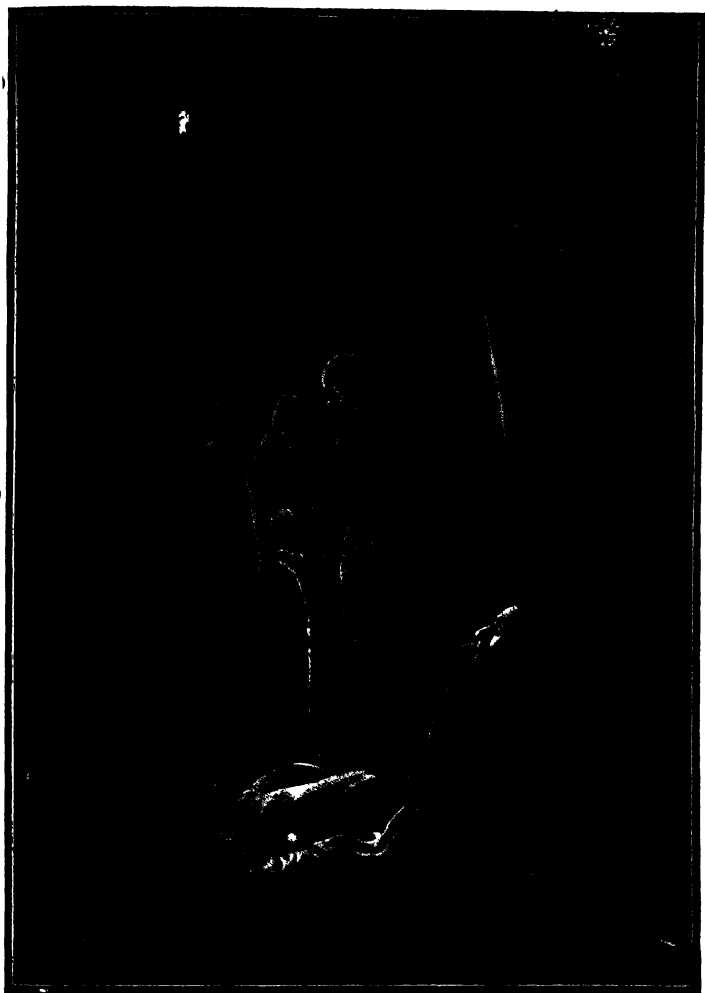
পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঐ অন্ধকারের মধ্যে ধব্‌ধবে সাদা কয়েকটা জীবন্ত কঙ্কাল পা ফেলে ফেলে আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে।

—১১২ পৃষ্ঠা

একটি সোজা পথ আছে—” এই বলে সে আর একটি সোজা' রাস্তার খবর আমাদের দিল।

বেলা অনেক হয়েছে। এতক্ষণ পথ হেঁটে আমাদের ক্ষিধেও পেয়েছে বেশ।

সেই বুড়ো লোকটির কেন জানি আমাদের উপর দয়া হোলো। সে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আমাদের চাপাটির মত কি একরকম খাবার খেতে দিল। পেট পুরে মহা আনন্দে তাই খেলাম। তারপর বুড়োকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে সেই সোজা পথ ধরে' আবার সাংহাইয়ের পথে হাঁটা দিলাম। সূর্য্য তখন পশ্চিমে হেলেছে।

পঁচিশ
গহন বন

ঠিক সন্ধ্যার আগে আমরা এসে হাজীর হলাম এক জঙ্গলের ধারে।

বাহাদুর বল্লে—"দেবকুমার বাবু, এখন কি করতে চান,—পথটাতো সোজা নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে;—একে অপরিচিত জায়গা, তার উপর সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে,—আমার মনে হয় এখন আর এই বনের মধ্যে না প্রবেশ করাই ভালো।"

দেবকুমার উত্তর দিলে—"আগে একটা কথা বলে নি, তারপর যা হয় একটা পরামর্শ করা যাবে। আমাকে আর 'দেবকুমার বাবু'—'আপনি'—এই সব বলবেন না,—আমরা সকলেই প্রায় সমবয়েসী, আর তা ছাড়া এর মধ্যেই যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেছে,—'আপনি' কথাটা কেমন জানি বে-সুরো বে-খাপ্পা শোনায়, কি বল শঙ্কর ?"

—"আলবৎ, দেবকুমার,—আমারও এই কথাটা অনেক-বারই মনে হয়েছে, খালি মুখ দিয়ে বের করিনি, পাছে তুমি কিছু মনে কর।" আমি উল্লাসের সঙ্গে বল্লাম।

—"এখন কি করা কর্ত্তব্য দেবকুমার ?" বাহাদুর বল্লে।

দেবকুমার উত্তর দিল—"এখন আর বিশ্রাম করবার কোনো দরকার নাই, যত তাড়াতাড়ি সাংহাইয়ে পৌঁছাতে পারি ততই ভালো। বৃথা সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

আমিও দেবকুমারের কথায় সায় দিয়ে বল্লাম—"হ্যাঁ, জঙ্গলটাও এমন কিছু নিবিড় বলে মনে হচ্ছে না। আর তিনজন আছি, এমন ভয়েরই বা কি আছে। ভয়কে তো আমরা প্রায় জয় করেই ফেলেছি। চল তাড়াতাড়ি এই জংলা পথটা পার হয়ে চলি।"

জোরে জোরে পা চালিয়ে আমরা পথ হেঁটে চল্লাম।

নির্জ্জন পথ কিন্তু নীরব নয়। ঘর-ফেরা পাখীদের আকুল চীৎকারে চারিদিক মুখরিত। মনে হোলো যেন বনের মধ্যে শিয়ালের দল চীৎকার করছে।

যত এগিয়ে চলেছি ততই যেন বনের গভীরতা বেড়ে উঠছে—এদিকে আকাশ ছেয়ে নেমে এলো জমাট অন্ধকার।

সকলের আগে চলেছিল বাহাদুর।—সে বল্লে "আর যে পথ ঠিক করতে পারছি না,—চারিধারের গাঢ় অন্ধকারে চোখে যেন ধাঁধা লেগে যাচ্ছে।"

বাহাদুরের কথা যথার্থই ঠিক। সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে কোথাও আর নজর চলছে না। উপরে একবার তাকিয়ে দেখলাম—মেঘহীন, নির্ম্মল আকাশে অগুন্তি তারা

ঝক্‌ঝক্ করছে। তাদের ক্ষীণ আলো আমাদের পথ দেখবার পক্ষে অতি অপর্য্যাপ্ত।

"তাই তো,—এ যে বড় মুশ্‌কিল হোলো দেখছি,—এই অন্ধকারে না পারা যাবে এগুতে, না পারা যাবে পেছুতে—অথচ এইভাবে বনের মধ্যে থাকাটাও নিরাপদ নয়"—

দেবকুমারের মুখের কথা শেষ হতে না হতে বাহাদুর চীৎকার করে' উঠ্‌ল—"ঐ দ্যাখো বনের মধ্যে কে যেন বাতি হাতে এইদিকে আস্‌ছে,—একজন নয়—দুজন।"

তাকিয়ে দেখলাম, নিবিড় জঙ্গল ভেদ ক'রে বাতি হাতে কারা যেন আমাদের দিকে আস্‌ছে।

দেবকুমার একটু ভেবে বললে—"আমার মনে হচ্ছে ও 'আলেয়া' ধরণের কোনো জিনিষ। এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে মানুষ আস্‌বে কোথা থেকে। প্রথমে তো জোনাকী বলেই ভুল করেছিলাম।"

"গাছে উঠে পড় দেবকুমার, গাছে ওঠো শঙ্কর, যদি বাঁচ্‌তে চাও,—বাঘ বাঘ—।" মুখের কথা শেষ করতে না করতেই বাহাদুর এক লাফে পাশের একটা গাছে উঠে পড়ল, আমরাও তাড়াতাড়ি তাকে অনুসরণ করলাম।

আলোয়ার আলোও নয়, কোনো লোক বাতি হাতেও এদিকে আস্‌ছে না,—ও দুটো বাঘের চোখ। ঐ গহন অন্ধকারের মধ্যে চোখ দুটো ভাঁটার মত জ্বল্‌ছে।

দেবকুমার বলে—"উঃ, এখুনি হয়েছিল আর কি। বাঘের চোখ যে এত বড় হতে পারে—কখনো কল্পনাও করতে পারি নাই।"

বাঘটা আমাদের দেখতে পেয়েছিল কিনা জানি না,—ঝোপঝাড় পেরিয়ে এক রকম গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে করতে সে সবেগে আমাদের গাছের তলা দিয়ে আবার বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হোলো বাঘটা যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে।

অন্ধকারের মধ্যে আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

বাঘটা চলে যেতেই দেবকুমার বাহাদুরকে উদ্দেশ্য করে' বল্লে—"বাহাদুর,—উঃ বড় জোর আজ বেঁচে গেছি।"

বাহাদুর কোনো উত্তর দিল না। আমি একটু জোরে বল্লাম—"বাহাদুর,—এস কাছাকাছি এসে বসি, তুমি বোধ হয় গাছের অনেকটা উপরে উঠে আছ।"

বাহাদুরের কোনো সাড়া শব্দ নাই। ভয়ে আমাদের বুক্‌টা ছাঁৎ করে' উঠ্‌ল—বাহাদুর কি তবে নীচে পড়ে গেল নাকি? বাঘটা তাহলে বাহাদুরকে মুখে করে' নিয়েই সবেগে পালিয়ে গেল নাকি? আর ভাবতে পারলাম না,—শরীরের রক্ত জল হয়ে গেল, মাথা টল্‌মল্‌ করতে লাগ্‌ল।

দেবকুমার তখনো গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে'—"বাহাদুর—বাহাদুর—।"

দেবকুমারের চীৎকারে সারা বন যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আমার হাত পা কেমন জানি অসাড় হয়ে গেল,—আমি ঝুপ্ করে' নীচে পড়ে গেলাম।

ছাব্বিশ
অজানা ভয়

গাছের তলায় পড়বামাত্র আমি শিউরে উঠ্‌লাম—কে যেন সবলে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি অতি কষ্টে চীৎকার করে উঠ্‌লাম "দেবকুমার,—মারা গেলাম।"

আমি যে গাছ থেকে পড়ে গেছি একথা দেবকুমার টের পেয়েছিল,—সেও তাড়াতাড়ি গাছের নীচে নেমে এল।

দেবকুমার নীচে এসে জিজ্ঞাসা করল—"কি ব্যাপার শঙ্কর?" কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিলাম, "বোধ হয় ভাল্লুকের হাতে পড়েছি, কে যেন আমাকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরেছে,—"

এমন সময় হোল এক অদ্ভুত ব্যাপার। একটা অতি উজ্জ্বল আলোর ঝল্‌ক সমস্ত আঁধার বনটা আলোকিত করে আবার মিলিয়ে গেল। বুঝ্‌লাম বিদ্যুতের আলো। সেই আলোতে আমি আর দেবকুমার দু'জনেই তাকিয়ে দেখলাম,—আমাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে' রয়েছে বাহাদুর।

আরে এ যে বাহাদুর। দু জনেই চমকে উঠ্‌লাম। যাক্‌—তা হলে তাকে বাঘে নিয়ে যায় নাই!

বাহাদুরকে যত জোরে ছাড়াতে চাই—ততই যেন সে বেশী করে আমাকে জড়িয়ে ধরে,—তার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট গোঙানী বের হচ্ছে,—লক্ষ্য করলাম।

এতক্ষণ আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। কোথা থেকে রাশি রাশি মেঘ এসে আকাশ ছেয়ে ফেল্লে,—আর মাঝে মাঝে চম্‌কাতে লাগ্‌ল বিদ্যুতের ঝলক্।

এতে আমাদের হোল ভালোই! এক একবার বিদ্যুৎ চমকায়—আর তাতে বেশ পরিষ্কার ভাবে আমরা বনের চারিধারটা স্পষ্ট দেখতে পাই।

কিছুক্ষণ পর বাহাদুর কথা কইল। দেবকুমার জিজ্ঞাসা করল—"বাঘের ভয়ে বুঝি গাছ থেকে পড়ে গেছিলে ?"

বাহাদুর বল্লে—"উঁহু।"

"তবে কি ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

বাহাদুর ততক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে আর সভয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছে। মুখে তার আর কোনো কথা নেই।

দেবকুমার এবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল "তুমি কি করে পড়ে গেলে হে শঙ্কর।"

উত্তর দিলাম—"তাও তো ঠিক বলতে পারছিনা, মনে হোলো কে যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিল।"

আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতে হঠাৎ বাহাদুর আঁৎকে উঠে চেঁচিয়ে বল্লে "ঐ ঐ।" তারপর ঊর্দ্ধশ্বাসে সামনের দিকে ছুট্ দিল।

পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঐ অন্ধকারের মধ্যে ধব্‌ধবে শাদা কয়েকটা জীবন্ত কঙ্কাল পা ফেলে ফেলে আমাদের

দিকে এগিয়ে আস্ছে, তাদের চলার তালে তালে শুকনো হাড়ের খট্ খট্ শব্দ হচ্ছে।

কড়্ কড়্ করে একবার মেঘ ডেকে উঠ্ল—আর তীব্র বিদ্যুতের হল্কায় সারা বনটা দিনের মত উজ্জ্বল হয়ে গেল। সেই আলোতে পথ দেখে আমি আর দেবকুমার বাহাদুরের পিছনে পিছনে প্রাণপণে ছুট্লাম। ভূতের পাল্লায় পড়েছি—আমরা ভূতের পাল্লায় পড়েছি।

যত ছুট্ছি, ততই সেই ভয়াবহ খট্খট্ শব্দ আমাদের পিছনে পিছনে ধাওয়া করছে। মনে হচ্ছে একটু হাত বাড়ালেই বুঝি আমাদের নাগাল পাবে আর টুঁটি টিপে ধরবে। পিছন ফিরে দেখবার মতও সাহস পাচ্ছি না।

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর সেই আলোতে আমরা পথ দেখে ছুটে চলেছি।

ছুট্তে ছুট্তে একটা ফাঁকা মাঠের ধারে এসে পৌঁছুলাম। এ দিকে আর জঙ্গল নাই, জঙ্গলটা ঘুরে অন্য দিকে চলে গেছে।

জঙ্গল পার হয়ে মাঠে এসে যখন পড়লাম তখন আর সেই প্রাণকাঁপানো খট্খট্ শব্দ শুন্তে পেলাম না।

বেজায় রকম হাঁপিয়ে পড়েছি। একটু বিশ্রাম না করলে আর চল্ছে না। আমি মাঠের উপর ধপ্ করে' বসে পড়লাম।

দেবকুমার বল্লে—"এখন বস্‌লে চলবে না, দারুণ ঝড় বৃষ্টি আস্‌ছে।"

আমি বল্লাম—"ঝড়বৃষ্টি আস্‌লে আর উপায় কি? যাবে কোন্ চুলোয়?"

দেবকুমার বল্লে—"নেহাৎ দেখছি তাহলে মাঠে মারা যেতে হবে।"

বাহাদুর এতক্ষণ চুপ্ করে' ছিল, তার ভয়ের ভাবটা এখনো ভালো করে' কাটে নাই। আবার একবার বিদ্যুৎ চম্‌কাতেই সে বলে উঠ্‌ল—"ঐ যে একটা আশ্রয় পাওয়া গেছে, চল শীগ্‌গির ওখানে যাওয়া যাক।"

এই বিজন বিভূঁয়ে আশ্রয় আবার কোথায়? বাহাদুর কি স্বপ্ন দেখছে নাকি, না প্রলাপ বকছে!

আমরা তাকিয়ে দেখ্‌লাম, কিছুদূরেই একটা রেলের লাইন, আর তার উপর দাঁড়িয়ে আছে একখানা মালগাড়ী।

আর কথা বার্ত্তা বলে সময় নষ্ট না করে' আমরা তিন জনেই ছুট্‌লাম সেই মালগাড়ীর দিকে।

এদিকে নাম্‌ল ঝমাঝম বৃষ্টি, আর তার সঙ্গে সুরু হোলো উদ্দাম ঝড়।

আমরা চট্‌পট্ একটা ছাদ্-ওলা মালগাড়ীতে উঠে বসলাম।

সাভাশ

মালগাড়ীতে

উঃ, খুব বাঁচা গেছে। ভাগ্যিস এই দারুণ দুর্য্যোগের সময় এই নিরাপদ আশ্রয়টা পাওয়া গেল।

আমরা তিনজনে বেশ আরাম করে' মালগাড়ীতে পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। আজ রাতের মত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

দেবকুমার বল্লে—"জীবনে কখনো ভূত বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু আজকে স্বচক্ষে যা দেখলাম তাকে ভূতুড়ে-ব্যাপার ছাড়া আর কিছু বলা যেতে পারে না।"

আমি বল্লাম—"এখন বুঝ্‌তে পারছি, সেই দুর্দ্দান্ত বাঘটা কিসের ভয়ে এমন সবেগে পালিয়ে গেছিল। আর বাহাদুরই বা কি দেখে গাছের থেকে পড়ে গেছিল, আর আমাকেই বা কে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিয়েছিল। উঃ, কী ভয়ঙ্কর, ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

বাহাদুর বল্লে—"এ পর্য্যন্ত অনেক প্রাণান্তকর বিপদের মধ্যে দিয়ে আমাদের আস্‌তে হয়েছে, কিন্তু আজ যে দৃশ্য দেখলাম—তার সঙ্গে কোনো বিভীষিকার আর তুলনা হয় না। সেই নিদারুণ খট্ খট্ শব্দ মনে করলেও শরীরটা ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে ওঠে।"

• আমি বল্লাম "তুমি বুঝি ঐ দৃশ্য দেখেই ভয়ে গাছ থেকে পড়ে গেছিলে ?"

বাহাদুর বল্লে—"শুধু ভয় পেয়ে পড়ে' যাবার মত ছেলে আমি নই,—মনে হোলো নীচের থেকে আমার পা ধরে কে যেন সবলে টেনে নামালো।"

"এঁ্যা, বাহাদুর বলে কি ? আরে আমারো তো সেই অবস্থা হয়েছিল। মনে হোলো অদৃশ্য হাতে কে যেন আমায় গলা ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিল।"

দেবকুমার বল্লে—"তা হলে আমারো নিশ্চয় সেই দশাই হোত, ভাগ্যিস্ আমি নিজে থেকেই তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেছিলাম।"

তুমুল বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে,—তার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়েছে উচ্ছৃঙ্খল ঝড়। এও যেন 'টাইফুনের' একটা ছোট-খাট সংস্করণ।

গল্প করতে করতে আমরা কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নাই, হঠাৎ জেগে উঠে দেখি মাল গাড়ী চল্‌তে আরম্ভ করে' দিয়েছে।

দেবকুমার চোখ মুছতে মুছতে বল্লে—"আরে, এতো মন্দ ব্যাপার নয় ! মালগাড়ীটা নিশ্চয়ই নান্‌কিনের দিকে চলেছে, নান্‌কিনে পৌঁছাতে পারলে আর কোনো ভাবনারই কারণ থাকবে না। ওখান থেকে অতি সহজেই আমরা সাংহাই যেতে পারব।"

দেবকুমারের কথায় আনন্দে আমাদের বুক ভরে' উঠ্‌ল। ভাবলাম ভগবান বুঝি এইবার আমাদের প্রতি মুখ তুলে চেয়েছেন। দেশ ছাড়ার পর থেকে যে সব অবস্থার মধ্যে দিয়ে পাক খেতে খেতে চলেছি ভুক্ত-ভোগী ছাড়া কেউ আর তার ধারণা করতে পারবে না।

তখনো গভীর রাত। মালগাড়ী আমাদের নিয়ে আপন মনে নিজের গন্তব্য পথে চলেছে।

কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম, এখন তিনজনেই আবার উঠে বসেছি।

বাহাদুর বল্লে "এ যে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গ লাভ হোলো দেখছি, এ রকম বিনা টিকিটে রেলগাড়ী চড়ে' যে নান্‌কিন্‌ যাব—কে ভাবতে পেরেছিল।"

দেবকুমার বল্লে,—"তাও আবার 'রিজার্ভ' করা। এ গাড়ীতে আর অন্য কোন যাত্রী উঠ্‌বে না।"

মাঝে মাঝে তখনো বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে, সেই আলোতে আমরা বাইরের দৃশ্য কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি। গাড়ীটা একটা ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে চলেছে; দূরে মনে হোলো যেন নদীর মত কি একটা জিনিষ দেখা যাচ্ছে।

মালগাড়ীটা মোড় ফিরে সেই দিকেই চল্ল।

বৃষ্টির ঝমাঝম শব্দ, বাজের কড়্‌ কড়্‌ নাদ, মালগাড়ী চলার ঝক্ ঝক্ আওয়াজ,—তার উপর ঘন ঘন ইঞ্জিনের বাঁশীর

ধ্বনি—এই সব এক সঙ্গে মিলে এক ভয়ঙ্কর হট্টগোলের সৃষ্টি করেছে।

ঝড়ের গতি যত বাড়ছে, গাড়ীর গতিও ততই বেড়ে চলেছে। এ সময় সমুদ্রে কিম্বা নদীতে থাকলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত।

কিন্তু আমরা চলেছি জমির উপর দিয়ে, মাটির উপর দিয়ে, তাই পরম নিশ্চিন্ত। জল ঝড় যতই মারাত্মক হোক আমাদের কিসের ভয়?

সশব্দে আমাদের গাড়ী একটা সেতুর উপর উঠল। সেই যে দূরে একটা নদী দেখা গেছিল এ সেতু তারই। কিন্তু এ কোন নদী?

হঠাৎ একি!! ভীষণ এক শব্দ—প্রকাণ্ড এক ধাক্কা, সমস্ত পৃথিবী যেন থর্ থর্ করে কেঁপে উঠ্ল,—আমাদের মালগাড়ী-খানা হুড়মুড় করে নীচে নদীর মধ্যে পড়ে গেল।

আঠাশ

চরম দুরবস্থা

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, কিছু বোঝা যায় না। অনুমানে বুঝ্‌লাম সেতু ভেঙ্গে আমাদের মালগাড়ী নীচে খরস্রোতা নদীর মধ্যে গিয়ে পড়েছে।

ইঞ্জিন শুদ্ধ সামনের গাড়ীগুলি মাঝ নদীতে তলিয়ে গেল। আমরা ছিলাম পিছনের দিকে—সহসা অভাবনীয় ভাবে শিকল ছিঁড়ে যাওয়ায় আমাদের গাড়ীখানা ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলতে লাগ্‌ল। পিছন দিকের আরো কয়েকখানা গাড়ী তখনো সেতুর বাইরে ছিল বলে সেগুলিও রক্ষা পেয়ে গেছে। আমাদের গাড়ীখানা কোনো রকমে তাদের সঙ্গে শেকল-বাঁধা অবস্থায় আট্‌কে রয়েছে। যদি কোন রকমে শিকলটা ছিঁড়ে যায় তবে আমরাও চিরজীবনের মত সলিল-সমাধি লাভ করব।

ক্রমাগতঃ বিপদে পড়ে' পড়ে'—আমাদের এখন বিপদটা যেন অনেকটা গা'-সওয়া হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম যেমন অল্পেতেই ভয়ে মুস্‌ড়ে পড়তাম—এখন যেন ভয়টাকে অনেকটা জয় করে' ফেলেছি। সহজে আর ঘাব্‌ড়াই না,—যতক্ষণ না বাস্তবিক মৃত্যু হয় তার আগে আর জীবন্মৃত হই না।

দেবকুমার বল্লে—"এ ভাবে বেশীক্ষণ থাকা ঠিক নয়,—যে

শিকলের সঙ্গে আমাদের গাড়ীখানা এখনো বাঁধা আছে—ঐ শোনো সেটাও 'পট্ পট্' করছে। এখুনি হয়ত ছিঁড়ে যাবে। নীচে যে রকম জলের তোড়—গাড়ীশুদ্ধ তার ভিতর পড়লে আর বাঁচ্‌বার কোনো উপায় থাক্‌বে না।"

আমি বল্লাম—"যদি কোনো রকমে এই গাড়ী থেকে বের হয়ে আমরা সেতুর উপর গিয়ে উঠ্‌তে পারি তবে অনেকটা বিপদ কাটে।"

বাহাদুর বল্লে—"তা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নাই। এ রকম বাদুড়-ঝোলা হয়ে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়।"

রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে,—আকাশ যদিও এখনো মেঘাচ্ছন্ন তবু বৃষ্টি থেমে গেছে, ঝড়ের তাণ্ডবও আর নাই।

অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে আমরা গাড়ী থেকে বেরিয়ে সেতুর উপর উঠ্‌বার চেষ্টা করতে লাগ্‌লাম।

দেবকুমার অনেক কষ্টে প্রথমে গিয়ে সেতুর উপরে উঠে পড়ল,—তারপর হাত বাড়িয়ে বাহাদুরকে উপরে টেনে তুল্ল। এইবার আমার পালা।

আমি যেই বাহাদুরকে ধরবার জন্যে উপরে হাত বাড়িয়েছি—অকস্মাৎ পটাং করে' শিকল ছিঁড়ে মালগাড়ী শুদ্ধ আমি নীচে পড়ে গেলাম। দেবকুমার আর বাহাদুর একসঙ্গে

আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌ল। নীচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি জ্ঞান হারালাম।

যখন জ্ঞান হোল তখন দেখি দেবকুমার আমার মাথায় আর চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিচ্ছে।

একি—তবে আমি মরি নাই! নদীর অতল জলে তলিয়ে যাই নাই? আমি ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে দেবকুমার আর বাহাদুরের দিকে চেয়ে রইলাম।

আমাকে চোখ মেলে চাইতে দেখে বাহাদুর উৎফুল্ল হয়ে বল্লে—"কেমন আছ শঙ্কর?"

আমি অতি মৃদু স্বরে বল্লাম "ভালো, কিন্তু এ ব্যাপার ঘট্‌ল কি করে বাহাদুর?—আমি বাঁচলাম কি করে দেবকুমার?" এই কয়টি কথা বলতেই আমি যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌লাম।

দেবকুমার বল্লে "বলছি সব, তুমি আর একটু সুস্থ হয়ে নাও।"

চারিধারে ভোরের আলো জেগে উঠেছে। আকাশ আবার পরিষ্কার হয়েছে, পূব আকাশে সোনার আলো ঝিল্‌মিল্‌ করছে।

আমি ধীরে ধীরে উঠে বস্‌লাম। দেবকুমার বল্লে "বরাৎ জোরে তুমি জলের মধ্যে না পড়ে' পড়েছ নদীর ধারের বালুর চরার উপর। মালগাড়ীর শিকল ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি যে তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে প্রকাণ্ড এক লাফ

মেরেছিলে—ভুলে গেলে নাকি ? মরীয়া হয়ে ঐ রকম লাফ মেরেছিলে বলেই আজ তুমি বেঁচে গেছ, নইলে নদীর জলে পড়লে তোমাকে আর রক্ষা করতে পারতাম না। দেখছ না নদীর স্রোতের কি রকম টান্ !”

তাকিয়ে দেখলাম, নদীর উপরে সেতুর একটা দিক ভেঙ্গে একেবারে চূর হয়ে গেছে, আর একদিকে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা দুর্দ্দশাগ্রস্ত মালগাড়ী। মনে হোলো নদীর আবর্ত্তের মধ্যে থেকে যেন ডুবন্ত ইঞ্জিনের আর্ত্তনাদ এখনো শোনা যাচ্ছে।

উনত্রিশ
মালগাড়ীর গার্ড

নদীর সেতুটা যে কি করে' ভেঙ্গে গেছে আমরা আন্দাজে সেটা অনুমান করতে পারলাম।

নদীর প্রবল স্রোতের টানে সেতুর একটা স্তম্ভ সরে গেছে তাই তার এই শোচনীয় অবস্থা। অন্ধকার রাতে ঝড় বাদলের মধ্যে মালগাড়ীর ড্রাইভার সে বিষয় কিছু জান্তে না পারায় অভাবিত অপমৃত্যু বরণ করেছে।

দেবকুমার বল্লে—"আমার একটা কথা মনে হচ্ছে, মালগাড়ীর শেষে তো গার্ডের গাড়ী থাকার কথা। শেষের সব গাড়ীগুলিই যখন বেঁচে গেছে তখন গার্ডেরও নিশ্চয় বাঁচ্‌বার কথা।"

বাহাদুর একবার দাঁড়িয়ে উঠে অবশিষ্ট গাড়ীগুলির দিকে তাকিয়ে বলে উঠ্‌ল—"ঐ যে সকলের শেষে গার্ডের গাড়ী, নিশ্চয় 'গার্ড' বেঁচে আছে, চল, তার খোঁজ করা যাক্।"

ততক্ষণে আমিও বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। বল্লাম—"চল দেবকুমার, গার্ডের খোঁজ করা যাক্, সে বোধহয় এই সব ব্যাপার দেখে একেবারে বেকুব বনে গেছে।"

নদীর খাড়া পাড়ি বেয়ে বেয়ে আমরা উপরে উঠে এলাম।

ঐ যে একটু দূরেই গার্ডের গাড়ী সেতুর এক প্রান্তে লাইনের উপর নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে।

দেবকুমার সোৎসাহে বল্লে—"ঐ যে গার্ড, ঐ যে গার্ড, পিছনের রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, একদৃষ্টে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।"

বাস্তবিকই দেখ্‌লাম চীনে গার্ড তার রেলের পোষাক পরে' গাড়ীর রেলিং ধরে' ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা দূর থেকে তাকে দেখে হাত তুলে অভিবাদন করলাম, সে কিন্তু আমাদের কোনো গ্রাহের মধ্যেই আন্‌ল না, যেমনি ভাবে দাঁড়িয়েছিল তেমনি ভাবেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, একটুও নড়ল চড়ল না পর্য্যন্ত।

"—দেখ লোকটা কি অভদ্র,—আমাদের ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত করছে না"—বাহাদুর বিরক্ত হয়ে বল্লে।

দেবকুমার বল্লে—"আহা, বেচারা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে, এই দুর্ঘটনার সমস্ত দায়িত্বই হয়ত ওর ঘাড়ে পড়বে, তাই ও একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে, ওর কোনো দোষ নাই।"

এই রকম আলোচনা করতে করতে আমরা গার্ডের গাড়ীর সামনে এসে হাজীর হলাম।

তখন পর্য্যন্ত গার্ড ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। মনে হোলো চোখের পলক পর্য্যন্ত পড়ছে না।

বাহাদুর জাপানী ভাষায় তাকে বল্লে—"ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে আপনি আশ্চর্য্য উপায়ে রক্ষা পেয়েছেন—"

গার্ড এবারও কোনো উত্তর দিল না। বোধ হয় জাপানী ভাষা ঠিক বুঝ্‌ল না।

দেবকুমার ধীরে ধীরে গাড়ীর উপর উঠে ভাবল পিঠ চাপ্‌ড়ে গার্ডকে একটু ভরসা দেবে। বেচারী দারুণ রকম মুষ্‌ড়ে গেছে। চীনে ভাষা না জান্‌লেও আকারে ইঙ্গিতে ওকে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে।

এই মনে করে দেবকুমার যেই গার্ডের পিঠে হাত দিল অমনি লোকটা হাত পা ছড়িয়ে জড় পিণ্ডের মত গাড়ীর মেঝের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। দেবকুমার বেজায় রকম ভড়কে গিয়ে এক লাফে গাড়ীর থেকে নেমে পড়ল! আমাদেরও চক্ষু স্থির!

বাহাদুর বল্লে—"একি হোল দেবকুমার, লোকটা কি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল নাকি?"

দেবকুমার উত্তর দিল—"না, একেবারে খতম!"

আমি শিউরে উঠলাম "এ্যাঁ, মরে গেছে?"

—"তাইতো মনে হচ্ছে, ওর গা হাত পা হিমের মত ঠাণ্ডা, মরেছে অনেকক্ষণ।" দেবকুমার বল্লে।

বাহাদুর বল্লে—"অনেকক্ষণ মরেছে তুমি বুঝলে কি করে' এই মাত্র সে তো রেলিং ধরে' ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল।"—

দেবকুমার বল্লে—"তার অনেক আগেই সে মরেছে, মৃত অবস্থায় ঐ ভাবে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

সর্ব্বনাশ! তবে কি গার্ডকে কেউ খুন করেছে নাকি?— কিন্তু তাও তো নয়। শরীরে তো কোন্ জখমের চিহ্ন নাই।

দেবকুমার বল্লে—"আমার ধারণা বাজ পড়ায় ওর মৃত্যু হয়েছে, দেখেছ তো কি রকম ঘন ঘন বাজ পড়ছিল। অন্য কোনো কারণ আমি ঠিক করতে পারছি না।"

বাহাদুর বল্লে "আমার কিন্তু অন্য রকম সন্দেহ হচ্ছে, সেই মারাত্মক জঙ্গলের জীবন্ত কঙ্কালদের কীর্ত্তি এ নয় তো?"

বাহাদুরের কথা শুনে আমার সমস্ত শরীরটা যেন ভয়ে শির্ শির করে' উঠল।

ত্রিশ
গাড়ীর নীচে

গার্ডের মৃত্যুটা আমাদের কাছে নিতান্ত রহস্যজনক বলেই মনে হোলো; শরীরে কোনো রকম আঘাতের চিহ্ন নাই, কাজেই খুন যে নয়—এ কথা আমরা স্থির বিশ্বাস করলাম।

হয় বাজের আঘাতে সে মরেছে,—কিম্বা ভয়ে 'হার্টফেল' করেছে। কিন্তু কিসের ভয়?

যে করেই হোক্, গার্ড যে মরেছে—সে বিষয়ে আর আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না।

দেবকুমার বল্লে—"গার্ডের বরাতে যখন মৃত্যু ছিল তখন সে মরত ঠিকই। বাজের আঘাতে ওর মৃত্যু না হলে নিশ্চয় ইঞ্জিন ড্রাইভারের মত জলে ডুবে মরত। আমাদের নেহাৎ মরণের ডাক পড়েনি তাই প্রত্যক্ষ মরণের হাত থেকেও অদ্ভুত ভাবে রক্ষা পেয়ে গেলাম।"—

বাহাদুর বল্লে বরাতে মৃত্যু থাক্‌লে অনেক আগেই আমাদের এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হোতো। যে সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমাদের আস্‌তে হয়েছে, তা' থেকে উদ্ধার পাওয়াটা অন্যের কাছে নেহাৎ অস্বাভাবিক।"—

আমি বল্লাম, "এখন ওসব কথা বলে আর ফল কি? কি করে সহরের দিকে যাওয়া যায় তার পরামর্শ এখন সকলের

আগে আমাদের করা উচিত। এখন সবে মাত্র ভোর হয়েছে। সন্ধ্যার আগে যে করেই হোক সহরে গিয়ে আমাদের পৌঁছানো দরকার।”

দেবকুমার বল্লে—“সোজা লাইন ধরে যদি যেতে পারা যেত তবে অতি সহজেই আমরা নান্‌কিনে গিয়ে পৌঁছাতে পারতাম। কিন্তু সেতুটা ভেঙ্গে যাওয়াতেই হয়েছে বিপদ, নদীর ওপারে যেতে না পারলে আর লাইন ধরে’ যাওয়ার কোনো উপায় নাই—”

দেবকুমারের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই মনে হোলো একদল লোক যেন চীৎকার করতে করতে দূরের মাঠ দিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আস্‌ছে।

—“ওরা আবার কারা? নিশ্চয় রেল কোম্পানীর লোক, দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে এদিকে আস্‌ছে।” আমি বলে উঠলাম।

দেবকুমার বল্লে,—“উঁহু, তুমি ঠিক ধরতে পার নাই, আমার ধারণা ওরা—” এই বলে দেবকুমার একটু চুপ করল।

আমি আর বাহাদুর একসঙ্গে বলে উঠলাম—“ওরা কারা?”

দেবকুমার রুদ্ধ শ্বাসে বল্লে “ডাকাত, মালগাড়ী লুট্ করতে আস্‌ছে,—ঐ ছাখো ওদের হাতে সব মারাত্মক অস্ত্র ঝক্ ঝক্ করছে।”

"তবে উপায় ?"—আমি আর বাহাদুর ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বল্লাম। আমার বারে বারে মনে হতে লাগল—ওরা সেই চীনে দস্যু দল নয় তো ?

দেবকুমার বল্লে—"ওরা প্রায় এসে পড়ল বলে,—আমাদের দেখতে পায়নি এখনো, আমরা গাড়ীর আড়ালে আছি।"

বাহাদুর বল্লে—"এখনো দেখতে পায়নি বটে, কিন্তু একটু পরেই ধরে ফেলবে। চল পালাই।"

"পালাবে কোথায় ? ফাঁকা মাঠ দিয়ে দৌড়াতে গেলে ওদের নজরে পড়তে হবে নিশ্চয়ই, এস এক কাজ করি, গাড়ীর তলায় গিয়ে লুকাই, এ ছাড়া আপাততঃ আর কোনো উপায় নাই।" দেবকুমার প্রায় এক নিশ্বাসে বল্লে।

ডাকাতের দল প্রায় এসে পড়েছে, আমরা আর দেরী না করে' মুহূর্ত্তের মধ্যে গাড়ীর তলায় লাইনের মাঝে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে বস্‌লাম।

হৈ হৈ করতে করতে ডাকাতের দল এসে পড়ল। দলে অন্ততঃ ডজন খানেক অস্ত্রধারী লোক।

তারা এসে গাড়ীতে চড়াও করে' মালপত্রের খোঁজ করতে লাগল। এদিকে তলায় বসে আমাদের ভয়ে বুক্ ঢিপ্ ঢিপ্ করছে, যদি কোনো রকমে একবার টের পায় তবে ঘাড় ধরে হিঁচড়ে আমাদের টেনে বার করবে। আর

এরা যদি সেই পূর্ব্বেকার চীনে দস্যুর দল হয়ে থাকে তবে ত আর কথাই নাই,—একেবারে সন্থ সন্থ লিং চিং।

কয়েকটা লোক গার্ডের গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ল। মনে হোলো মৃত গার্ডকে দেখে তারা জানি কি বলাবলি করছে। তারপর তারা গাড়ী থেকে ছুঁড়ে গার্ডকে সজোরে নীচে ফেলে দিল। আমরা চমকে উঠ্‌লাম।

ডাকাতের দল এক গাড়ী থেকে নেমে আর এক গাড়ীতে যাচ্ছে—আমরা তাদের পা'গুলি দেখতে পাচ্ছি, উঃ কী মোটা মোটা আর বেঁটে বেঁটে। পায়ের পাতাগুলি অদ্ভুত রকমের থ্যাব্‌ড়া। দেখলে মানুষের পা বলে মনে হয় না কিছুতেই।

একত্রিশ

দস্যুদের আক্রোশ

মালগাড়ীগুলি একদম খালি। ডাকাত দল যে সম্পূর্ণ নিরাশ হবে সেটা আমরা আগেই বুঝ্তে পেরেছিলাম।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর যখন লুট করার মত কিছুই পাওয়া গেল না,—ডাকাত দল্ গেল বেজায় রকম চটে। তাদের এতটা পরিশ্রম পণ্ড হোলো, এতটা সময় বৃথা নষ্ট হোলো।

তাদের সমস্ত রাগ আর আক্রোশ এখন পড়ল এসে সেই মৃত গার্ডটার উপর। একজন এসে ধারালো এক খাঁড়া দিয়ে ঘ্যাচাং করে সেই লাশটার দেহ থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে খসিয়ে ফেল্ল।

গাড়ীর তলায় বসে আমরা স্পষ্ট এই দৃশ্য দেখতে পেলাম। মরার উপরেই খাঁড়ার ঘা—যদি কোনো রকমে একবার জান্তে পারে গাড়ীর তলায় তিনজন জীবন্ত প্রাণী বসে আছে তা হলে আর রক্ষা নাই।

এর মধ্যে আর এক কাণ্ড; বাহাদুরের নাকে একটা মাছি না মশা কি এসে ঢুকে পড়ায় সে হেঁচে ফেলেছিল আর কি! অনেক কষ্টে সামলে গেছে তাই রক্ষে।

দেবকুমার ফিস্ ফিস্ করে বল্ল—“আর আত্মগোপন করা

গেল না—ঐ ছাখো ডাকাতের দল সবাই জোট্ করে এক সঙ্গে মালগাড়ীগুলিকে ঠেলতে আরম্ভ করেছে। মতলব বোধ হয়, নদীর জলে বাকী গাড়ীগুলিকেও বিসর্জ্জন দেবে।”

আমাদের মাথা ঘুরে গেল,—হায় হায়,—আর বুঝি লুকিয়ে থাকা গেল না।

ডাকাতদের ঠেলায় মালগাড়ীগুলি একটু একটু সরছে নদীর দিকে, আমরাও গাড়ীর নীচে ঘাড় হেঁট করে হামাগুড়ি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেছি।

এই ভাবে আর কতটা যাওয়া যাবে? শেষ পর্য্যন্ত কি আমাদেরও নদীর জলে আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে! সেও তো বড় ভয়ঙ্কর কথা? ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা পেতে এই দুরন্ত নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়াও যা, আর ফুটন্ত তেল থেকে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়াও তা।

মালগাড়ীগুলি এতক্ষণ বেশ আস্তে আস্তে সরে চলেছিল ডাকাতদের ঠেলায়, এইবার হঠাৎ থেমে গেল। মনে হোলো কিসে যেন আটকে গেছে।

মালগাড়ীগুলিকে অনেক করে'ও আর ঠেলতে না পেরে ডাকাতদল এইবার হাল ছেড়ে' দিল। তারপর হল্লা করতে করতে আবার তারা ফিরে গেল।

আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে গেল।

এতক্ষণ ঘাড় গুঁজে গাড়ীর নীচে বসে থেকে শরীরে ব্যথা হয়ে গেছিল, হাত পায়ে খিল ধরে' গেছিল।

বাইরে বেরিয়ে এসে বাহাদুর বলে—"উঃ খুব বাঁচা গেছে এবারও।"

দেবকুমার বল্লে,—"ভাগ্যিস্ তুমি হাঁচিটা সাম্‌লে নিয়েছিলে; নইলে আর বাঁচ্‌তে হোতো না। দেখলে না মরা গার্ডের উপরেই ওদের কত আক্রোশ! জীবন্ত লোক পেলে তো আর কথাই থাকত না।"

আমি বল্লাম—"দেবকুমার, এস আমরা এখানে বসেই অপেক্ষা করি। এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে রেল কোম্পানীর লোক নিশ্চয়ই তদারক করতে আস্‌বে, তাহলে অবশ্যই আমাদের একটা হিল্লে হবে। আন্দাজের উপর নির্ভর করে' আর কোথাও যাওয়া ঠিক নয়।"

দেবকুমার বল্লে—"তোমার কথাটা খুবই ঠিক। রেল কোম্পানীর লোক নিশ্চয়ই শীগ্‌গির এসে পড়বে, কারণ এই দুর্ঘটনার খবর তাদের জান্‌তে আর বাকী থাক্‌বে না। কিন্তু তার আগেই আমাদের এখান থেকে সড়ে' পড়া দরকার।"

—"তার মানে?"—বাহাদুর আর আমি দু'জনেই উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

—"তার মানে হচ্ছে,—রেল কোম্পানীর লোকেরা যখন এসে মুণ্ডু-কাটা গার্ডকে ধরশায়ী অবস্থায় দেখবে তখন হয়ত

আমাদেরই সন্দেহ করে' বস্‌বে। আমরা তিন জন অপরিচিত বিদেশী, তার উপর এখনকার চেহারা আর পোষাক পরিচ্ছদ দেখে আমরা যে ভদ্র বংশীয় তা কেউ মনে করতে পারবে না। ছদ্মবেশী শত্রু বলে মনে করাও আশ্চর্য্য নয়। চীনে ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ,—কাজেই আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা তাদের কিছুই বোঝাতে পারব না; পক্ষও সমর্থন করতে পারব না। আবার নতুন একটা ফ্যাসাদে পড়ে যাব। সেতু ভেঙ্গে যে মালগাড়ীর খানিকটা অংশ নদীতে পড়ে গেছে, সেটাও আমাদের কীর্ত্তি বলে' ওদের ধারণা হোতে পারে।"

দেবকুমারের কথা শেষ হতে না হতেই দেখতে পেলাম, দূরে লাইন দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আর বাঁশী বাজাতে বাজাতে একখানি গাড়ী এই দিকে আস্‌ছে।

বত্রিশ
দুর্বিপাকে

রেল লাইনের দু' ধারেই ফাঁকা মাঠ। দৌড়ে গিয়ে যে কোথাও গা' ঢাকা দেব তারও জো নাই। এই ফাঁকা মাঠের ভিতর দিয়ে যদি এখন ছুট্‌তে আরম্ভ করি তবে নিশ্চয়ই কোম্পানীর লোকেরা আমাদের দেখে ফেলবে। ছুট্‌তে দেখলে ওদের সন্দেহ দৃঢ়তর হবে,—যে কোনো প্রকারেই হোক ওরা আমাদের ধ'রে ফেলবেই। জ্যান্ত ধরতে না পারলে গুলি করে' মেরে ফেলতে পারে।

দেবকুমার বল্লে—"নদীর ঢালু বাঁকের ধারে কতগুলি বড় বড় পাথর দেখা যাচ্ছে,—শীগ্‌গির চল তার পাশে গিয়ে লুকাই। ট্রেণটা এসে পড়ল বলে।" এই বল্‌তে বল্‌তে দেবকুমার ছুট্‌তে সুরু করে' দিল—আমরাও ঊর্দ্ধশ্বাসে তাকে অনুসরণ করলাম।

নদীর ঢালু বালুর চরায় কতকগুলি পাথর পড়েছিল,—আমরা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে তার আড়ালে লুকালাম।

পাথরের আড়াল থেকে দেখতে পেলাম, একদল লোক ট্রেণ থেকে নেমে সেই ছিন্ন-মুণ্ড গার্ডকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ করেছে। কেউ কেউ আবার মালগাড়ীগুলিকে পরীক্ষা

করছে,—দুই একজন এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে ভাঙ্গা সেতুটাকে ভালো করে' দেখছে।

এরা যে রেল কোম্পানীর লোক সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই রইল না।

আমরা আড়ালে বসে একমনে এই দৃশ্য দেখছি হঠাৎ দেবকুমার গড়াতে গড়াতে নীচে নদীর জলের দিকে পড়ে যেতে লাগ্‌ল।

—"ওকি দেবকুমার, তোমার হোলো কি,—সামনের ঐ গাছের গুঁড়িটা ধরে' ফেল শীগ্‌গির,—নইলে জলে পড়ে' যাবে —একবার স্রোতের টানে পড়লে আর আত্মরক্ষা করতে পারবে না।" আমি চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌লাম।

এতক্ষণে দেবকুমার অনেকটা সামলে নিয়েছে,—গাছের গুঁড়িটা ধরে' সে বলে উঠ্‌ল্ "তোমারও তাড়াতাড়ি এখানে চলে এস যদি বাঁচ্‌তে চাও,—একটুও আর দেরী কোরোনা।"

দেবকুমারের কথা শোনা মাত্র অজানা ভয়ে আমাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠ্‌ল। আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার আগেই আমরা এক রকম গড়িয়ে গড়িয়েই দেবকুমারের কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

—"কি ব্যাপার দেবকুমার—এখানে আবার কিসের ভয়—" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"পাথরের পাশে ঐ ছাখো—" এই বলে দেবকুমার উপরের দিকে কি জানি একটা দেখালো।

"কি আবার,—পাথর ছাড়াতো আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না—।" আমি বল্লাম।

কাঁপা গলায় হঠাৎ বাহাদুর বলে উঠ্‌ল—"ওঃ—আমি দেখতে পেয়েছি,—মস্ত এক অজগর পাথরের পাশে পেট ফুলিয়ে পড়ে আছে।"

দেবকুমার বল্লে—"ঠিক বলেছ বাহাদুর,—আমি ওটাকে প্রথমে পাথর ভেবে ওর গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিলাম, তার পরে একটু নড়ে উঠ্‌তেই বুঝ্‌তে পারলাম, ওটা একটা রাক্ষুসে অজগর। উঃ, আজ আর একটা ফাঁড়া কাট্‌ল!"

এতক্ষণে আমার হুঁশ হোলো। অজগরটা যেমনি কালো তেমনি মোটা,—প্রথমে দূর থেকে কালো পাথর বলেই ভুল হয়।

অজগরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে বেশ নিশ্চিন্তে পড়েছিল। আমাদের সাড়া পেয়ে একবার মুখ তুলে চাইল, তারপর ধীরে ধীরে সরে' সরে' আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগল।

দেবকুমার বল্লে—"এখন আর এখানে থাকা চলবে না। অজগরটা যা বিরাট,—ইচ্ছা করলে আমাদের গিলেও ফেলতে পারে। কাজেই পালানোই এখন বুদ্ধিমানের কাজ।"

পালাবো তা নিশ্চয়ই,—কিন্তু কোন্ চুলোয়?

আর নীচের দিকে নামা যায় না, তীর ঘেঁসেই নদীর প্রখর স্রোত বয়ে চলেছে। দুর্দ্দান্ত পাহাড়ে-নদী—জলে যে ঝাঁপিয়ে পড়ব তারও উপায় নাই। ওদিকে আবার আর এক বিপদ। হঠাৎ বাহাদুর চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল "যে দিকে হোক্ শীগ্‌গির পালাও, জলের থেকে একদল হাঙ্গরের মত কি জন্তু একে একে উঠে আসছে আমাদের দিকে।"

উপরে অজগর তেড়ে আস্‌ছে,—নীচে ক্ষুধিত হাঙ্গরের দল। এখান থেকে পালাতে গেলেই রেল কোম্পানীর লোকদের নজরে আবার পড়ে' যাব। কাজেই আমাদের অবস্থা হোলো ভয়ঙ্কর শোচনীয়!

দেবকুমার বল্লে—"একটি মাত্র উপায় হচ্ছে, আমাদের এই বাঁকের মুখে পালানো। এসো আর দেরী কোরো না। নদীর এই ঢালু পথ দিয়ে সাবধানে ঐ বাঁকের মুখে যাই চল। সাবধান, যেন পা পিছলে না যায়।"

তেত্রিশ

খাগ্‌ড়ার ঝোপ

বাঁকের মুখে খুব বড় বড় খাগড়ার ঝোপ। আমরা অতি সাবধানে এসে সেই ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করলাম।

ওদিকে বেধে গেল এক তুলক্লাম ব্যাপার।

আমাদের তাগ্ করে' অজগরটা এতক্ষণ নীচের দিকে সড়াৎ সড়াৎ করে' নেমে আস্‌ছিল। এইবার গিয়ে পড়ল সেই হাঙ্গরগুলোর মুখে। তারপর যা' ব্যাপার আরম্ভ হোলো—চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না।

আক্রান্ত হয়ে অজগরটা প্রথমে যেন একটু থতমত খেয়ে গেল, তার পরই বিরাট এক হাঁ করে'—একটা হাঙ্গরকে আস্ত গিলে ফেল্ল। অজগর সাপ যে অত বড় 'হাঁ' করতে পারে—আমরা কোনো দিন কল্পনাই করতে পারি নাই। যেই একটা হাঙ্গরকে গিলেছে,—অমনি চক্ষের নিমেষে হাজারে হাজারে হাঙ্গর জল থেকে উঠে এসে সাপটাকে ঘিরে ফেল্ল। তারপর তাদের ধারালো দাঁত দিয়ে সাপটাকে খণ্ড খণ্ড করে' কেটে ফেলতে লাগল। একা সাপ অতগুলো হিংস্র হাঙ্গরের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম,—ক্রুদ্ধ হাঙ্গরের দল টান্‌তে টান্‌তে সেই বিধ্বস্ত সাপটার ক্ষত-বিক্ষত দেহটাকে জলের ভিতরে টেনে নিয়ে

গেল। সাপটা তখন পর্য্যন্ত বিপুল বলে ধস্তা-ধস্তি করছিল, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তখন পর্য্যন্ত তার সে কী উদ্দাম চেষ্টা! কিছুক্ষণ পর সব চুপ্‌ চাপ্‌।

দেবকুমার বল্লে—"ঐ মারাত্মক সাপের হাতে পড়লে আমাদের অবস্থা যে অতি সঙ্কটজনক হয়ে উঠত——সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নাই।"

বাহাদুর বল্লে—"অজগরের চেয়েও ভয়ঙ্কর ঐ রাক্ষুসে হাঙ্গরগুলি,—ওগুলির হাত থেকেও আজ খুব বাঁচা গেছে।"

আমি বল্লাম—"এই নদীতে যে বিস্তর হাঙ্গর আছে—সেটা এখন বেশ বোঝা গেল, হাঙ্গর যখন আছে তখন কুমীরও অবশ্য আছে। ভাগ্যিস্‌ সেই মালগাড়ী থেকে জলে না পড়ে' ডাঙ্গায় পড়েছিলাম!"

এমন সময় দেবকুমার বল্লে—"ঐ ত্যাখো,—মনে হচ্ছে একটা ডিঙ্গি নৌকা এদিকে আস্‌ছে,—।"

দেবকুমারের কথায় আমরা লক্ষ্য করে' দেখ্‌লাম বাস্তবিকই একজন লোক একটা নৌকা বেয়ে আমাদের দিকেই আস্‌ছে। স্রোতের প্রবল টানে নৌকাটা তর্‌ তর্‌ করে' ভেসে আস্‌ছে।

আমরা যেখানে ঝোপের-আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে'-ছিলাম, নৌকাটা তার খানিকটা দূরে এসে ভিড়ল।

দেবকুমার ফিস্‌ফিস্‌ করে' বল্লে—"লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে জেলে। ঐ ত্যাখো নৌকার উপর একটা মাছ ধরবার জাল।"

লোকটা নৌকা থেকে নেমে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে নৌকাটাকে বাঁধ্‌ল, তারপর ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

দেবকুমার বল্লে—"এই একটা মস্ত সুযোগ উপস্থিত। লোকটা যেই একটু দূরে চলে যাবে, আমরাও চট্‌পট্‌ ওর নৌকাটা দখল করে' মাঝ দরিয়ায় ভাসিয়ে দেব। না হলে এখান থেকে অন্যত্র যাবার আর কোনো উপায় দেখছি না।"

লোকটা নদীর ঢালু পাড় বেয়ে যেই উপরে উঠল, আর আমরাও ঝটাপট্‌ খাগড়ার বন থেকে বেরিয়ে এসে নৌকায় উঠে বস্‌লাম।

আমি আর দেবকুমার নৌকায় উঠে বসেছি, আর বাহাদুর দড়ির বাঁধন খুলে ফেলছে, এমন সময় হঠাৎ আমাদের দেখতে পেয়ে.চীৎকার করতে করতে লোকটা আমাদের দিকে তেড়ে ছুটে এলো।

নৌকার দড়ি তখন পর্য্যন্ত খোলা হয় নি, কাজেই আমরা নৌকা ছাড়তে পারছি না। বাহাদুর তখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দড়ি খোলার চেষ্টা করছে।

লোকটা ততক্ষণ আমাদের প্রায় কাছে এসে পড়েছে, তার হাতে বর্শার মত একটা মাছ মারবার ধাঁরালো 'ট্যাঁটা'।

দেবকুমার আর উপায় না দেখে ডিঙ্গির উপরের সেই মাছ ধরবার জালটা নিয়ে তার দিকে সজোরে ছড়িয়ে ছুঁড়ে

মারল, ঠিক যেমন করে' জেলেরা নদীতে জাল ছোঁড়ে। অদ্ভুত ব্যাপার, আশ্চর্য্য কাণ্ড, লোকটা জালে পড়ে গেল আট্‌কা। ততক্ষণে নৌকার দড়ি খুলে ফেলে বাহাদুরও নৌকায় উঠে এসে বসেছে।

চৌত্রিশ

স্রোতের টানে

প্রবল স্রোতের মুখে আমাদের নৌকা তীরবেগে ছুটে চল্ল। তাকিয়ে দেখ্‌লাম তীরের উপর লোকটা সেই জাল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে। কিন্তু জালটা এমন ভাবে তার শরীরে জড়িয়ে গেছে যে কিছুতেই সে আর মুক্ত হতে পারছে না।

দেবকুমার একটু মুচ্‌কি হেসে বল্লে—"একেই বলে নিজের ফাঁদে নিজে পড়া। নিজের জালে বাছাধন এমন আট্‌কা পড়েছেন যে আর সহজে পরিত্রাণ পাবার উপায় নাই।"

নৌকার একটি মাত্র দাঁড়। কিন্তু দাঁড় টানবার কোনোই দরকার হোলো না, স্রোতের টানে আমাদের নৌকা নিজেই ছুটে চল্ল সোঁ সোঁ করে'।

বাহাদুর বল্লে—"যা জোরে নৌকা ছুট্‌ছে, তাতে ভয় হচ্ছে আবার কোনো পাথরে টাথরে না ঠোকর লাগে। নদীর ধারে ধারে যা সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর।"

বাস্তবিক ভয়েরই কথা। স্রোতটা নদীর একটা তীর ঘেঁসেই চলেছে, আমাদের নৌকাও প্রায় ডাঙ্গার কাছ দিয়েই ছুটেছে। তাই পাথরে চোট লাগার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

দেবকুমার বল্লে—"আমাদের এখন লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে

নৌকোটা কোনো মতেই ডাঙ্গার কোনো পাথরে না লেগে যায়, তাহলে নৌকা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে, আমরাও বেমালুম জলে পড়ে' যাব। নদীর জলের মধ্যেও অনেক পাথর মাঝে মাঝে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে, তার থেকেও নৌকা বাঁচানো একান্ত দরকার।"

বাহাদুর দাঁড়খানা নিয়ে নৌকার সামনের দিকে গিয়ে বসল, যেই কোনো পাথরে নৌকা ঠেকবার উপক্রম হয়, সে তখুনি পাথরের গায়ে দাঁড় ঠেকিয়ে নৌকাটাকে অন্য দিকে ঠেলে ছায়। এই রকম করে' আমরা নৌকা বাচিয়ে বাঁচিয়ে এগিয়ে চলতে লাগ্‌লাম।

কিন্তু যাচ্ছি কোথায়! দেবকুমার বল্লে—"যেখানেই যাই, নদীর ধারে কোনো সহর আমাদের চোখে পড়বে নিশ্চয়ই ; তা হলেই বোঝা যাবে আমরা কোথায় এসেছি। সেখান থেকে আমরা সাংহাইয়ে যেতে পারব।"

বাহাদুর বল্লে—"একটা জিনিষ লক্ষ্য করছ দেবকুমার? নদীর স্রোতের টান যেন ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে।"

দেবকুমার বল্লে "সেটা আমিও লক্ষ্য করছি বাহাদুর, এ সব পাহাড়ে-নদীতে স্রোতের টান বড় ভয়ঙ্কর হয়। যাক্ তাতে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না, আমরা যে রকম গতিতে চলেছি তাতে খুব তাড়াতাড়ি আমরা কোনো লোকালয়ে এসে পৌছাতে পারব।"

আরো এক ঘণ্টা কেটে গেল। নদীটা এতক্ষণ সোজা দক্ষিণ-মুখে বয়ে চলেছিল, এইবার দেখ্‌লাম পূবদিকে ঘুরে গেছে।

এই বাঁকের মুখে জলের তোড় এত সাংঘাতিক যে প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছিল এই বুঝি আমাদের নৌকা উল্‌টে যায়। একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজও এইবার আমাদের কাণে এসে পৌঁছাতে লাগল। মনে হোলো যেন সমুদ্রের কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা।

নদীর দুই তীরে আবার আরম্ভ হয়েছে ঘন জঙ্গল, লোকালয়ের কোন চিহ্নমাত্র এ পর্য্যন্ত আমাদের নজরে পড়ে নাই।

বাকের মুখে আমাদের নৌকাটা ঘুরতেই দেবকুমার আঁৎকিয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল—"মৃত্যু—মৃত্যু,—সদ্য মৃত্যু—আর বাঁচা গেল না।"

যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমাদের হাতে পায়ে খিল ধরে গেল, বুদ্ধিশুদ্ধি প্রায় লোপ পাবার যোগাড়!

নদীটা বাঁকের মুখে প্রচণ্ড বেগে ভীষণ গর্জ্জন করে' প্রায় দু'শো ফিট নীচে গিয়ে আছড়ে পড়েছে। এই আওয়াজকেই আমরা একটু আগে সমুদ্র-গর্জ্জন বলে' ভুল করেছিলাম।

না, সত্যিই আর বাঁচা গেল না। আমাদের নৌকা ঐ উদ্দাম স্রোতের সঙ্গে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে চল্ল। আমরা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত।

দেবকুমার বল্লে—শেষ পর্য্যন্ত আমাদের চেষ্টা করে দেখতে হবে, যতক্ষণ বাস্তবিক মরণ না হয়—তার আগে পর্য্যন্ত যে কোনো প্রকারে হোক্ বাঁচতে চেষ্টা করবই। বাহাদুর, শঙ্কর, অত মুস্ড়ে গেলে চলবে না, ঐ ছাখো নদীর তীরে কতগুলি বাঁশ ঝাড় জলের উপর নুয়ে আছে। এস আমরা নৌকার মায়া ছেড়ে ঐ বাঁশ ঝাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, আর সময় নাই।" এই বলে দেবকুমার সেই নুয়ে-পড়া বাঁশ ঝাড় লক্ষ্য করে' জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আর অন্য কোনো উপায় নাই দেখে আমি আর বাহাদুরও নৌকা ছেড়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের খালি নৌকাটা স্রোতের ধাক্কায় একবার শূন্যে লাফিয়ে উঠে ঘুরপাক খেতে খেতে ভয়ঙ্কর বেগে নীচে আছড়ে পড়ল।

পঁয়ত্রিশ

শেষ

স্রোতের টান এখানে অতিশয় প্রবল হলেও, জলের গভীরতা খুব কম। বুঝ্‌তে পারলাম নদীটা একটা পাহাড়ের উপর দিয়ে নীচে ঝরে পড়ছে।

বাঁশ গাছের ডালপালা ধরে' আমরা কোনো রকমে আত্ম-রক্ষা করলাম। হাঁটু-জলে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তবু মনে হচ্ছে প্রতি মুহূর্ত্তেই বুঝি আমরা স্রোতের টানে ভেসে যাব।

শেষে অনেক কষ্টে ঐ স্রোতের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করে' আমরা ডাঙ্গায় এসে উঠ্‌লাম। সকলেরই হাত পা ছড়ে গেছে। আমার মাথায় আবার ভীষণ জোরে এক চোট লেগেছে।

ডাঙ্গায় উঠে হতাশ ভাবে বলে উঠলাম "—এই রকম ভাবে আর পারা যায় না, জীবনের উপর একটা ধিক্কার এসে গেছে, প্রতি পদে এই রকম মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়ে এসো আমরা মৃত্যুর কোলেই আশ্রয় নেই। সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে যাবে ; এমনি করে' আর যে পেরে উঠ ছি না !"

দেবকুমারের মুখে কোনো কথা নাই, বাহাদুরও নিরুত্তর। কীইবা আর উত্তর দেবে।

জঙ্গলের ধারে একটা ফাঁকা জায়গায় বিশ্রাম করবার জন্যে আমরা গিয়ে বসলাম। সূর্য্য তখন মাথার উপর।

সকলেই চুপচাপ বসে আছি। কারুর মুখে কোনো কথা নাই। সমস্ত কথাই যেন আমাদের ফুরিয়ে গেছে, কথা বলবার সমস্ত উৎসাহই যেন নিভে গেছে।

এমন সময় শুনতে পেলাম আমাদের অনেকটা নীচের দিকে একটি মেয়ে মানুষ যেন করুণ কণ্ঠে চীৎকার করছে।

দেবকুমার বলে উঠ্‌ল "—শুনছ শঙ্কর, শুনছ বাহাদুর, মেয়ে মানুষের গলা. নিশ্চয়ই কোনো চীনে স্ত্রীলোক বিপদে পড়েছে। ব্যাপারটা আমাদের জানা দরকার। যদি কোনো সাহায্য করতে পারি—অবশ্যই করব।"

দেবকুমারের কথা শুনে আমরা মুহূর্ত্তের মধ্যে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম—তারপর ছুটে চল্লাম ঐ করুণ আর্ত্তনাদ লক্ষ্য করে'।

"ঐ যে একটা দুর্বৃত্ত মস্ত এক ছোরা নিয়ে একটি চীনে স্ত্রীলোককে তাড়া করেছে"—বাহাদুর রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠ্‌ল।

আমি বল্লাম—"স্ত্রীলোকটি নিরুপায় হয়ে দস্যুর হাত থেকে বাঁচতে যে রকম ভাবে ঐ নদী-প্রপাতের দিকে ছুটে চলেছে, এক্ষুণি ও প্রবল স্রোতের মুখে গিয়ে পড়বে, তা হলে আর রক্ষা থাকবে না।"

বাহাদুর বল্লে "ছুটে চল, ছুটে চল—আমরা তিন জন

আছি, একা দস্যু আমাদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌বে না, স্ত্রী-লোকটিকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে।" এই বলে আমরা ছুট্‌তে যাচ্ছি এমন সময় দেবকুমার বল্লে—"থামো, থামো আর যেতে হবে না, বাস্তবিক দস্যুর কবলে কোনো স্ত্রীলোক পড়েনি, ওটা নিছক অভিনয়, ঐ দ্যাখো একদল লোক কিছুদূরে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার হাতল ঘুরাচ্ছে—ওরা সিনেমার ছবি তুলতে এসেছে।"

আরে তাই তো! উঃ, কী ভুলটাই আমরা করে' বসছিলাম। এখুনি হয়েছিল আর কি। এই চরম দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যেও আমরা হেসে ফেল্লাম।

দেবকুমার বল্লে—"এখন এক কাজ করা যাক্, ঐ সিনেমার লোকদের আমাদের দুর্দ্দশার কথা জানাই, ওদের দলে অনেক জাতীয় লোক আছে দেখতে পাচ্ছি। কয়েকজন সাহেব আছে বলেও মনে হচ্ছে।"

আমরা আর সময় নষ্ট না করে' ওদের কাছে গিয়ে হাজীর হলাম।

আমাদের চেহারা ও পোষাক পরিচ্ছদের এমন অবস্থা হয়েছে যে আমরা কোন্ দেশী লোক আমাদের দেখে তা কেউ বুঝ্‌তে পারলে না।

যখন তারা জানতে পারল আমরা বাঙ্গালী তখন তাদের মধ্যে থেকে একজন টুপী খুলে হেসে বল্লে "আমিও বাঙ্গালী,

এখানে বিখ্যাত লো-হাউ সিনেমা কোম্পানীতে কাজ শিখতে এসেছি, নানকিনে থাকি।”......

* * *

চীনের রাজধানী নান্‌কিনে এসে শুন্‌লাম সাংহাই বন্দরে সম্প্রতি একটা জাহাজ এসে লেগেছে। জাহাজখানা কল্‌কাতা থেকে জাপান যাচ্ছিল, পথে অতি রহস্যজনক-ভাবে দু'জন বাঙ্গালী যুবক তা' থেকে অদৃশ্য হয়। তাদের আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

খোঁজ নিয়ে জান্‌লাম জাহাজখানির নাম 'তোয়াং মারু'—আমাদের সেই জাহাজ। আর যে দু'জন বাঙ্গালী যুবক অদৃশ্য হয়েছে—তাদের নাম হচ্ছে শঙ্কর আর বাহাদুর।

সেই দিনই সাংহাই গিয়ে হাজীর হলাম। সেই বাঙ্গালী যুবক—যিনি সিনেমার কাজ শিখতে চীন দেশে এসেছিলেন, তিনি আমাদের অনেক রকমে সাহায্য করলেন। তাঁর কথা আমরা জীবনে আর কোনো দিন ভুলতে পারব না।

আবার 'তোয়াং মারু' জাহাজ, আবার সেই কেবিন, সেই পরিচিত যাত্রীদল। দেবকুমারও আপাততঃ আমাদের সঙ্গে জাপানে চলেছে। সেখান থেকে তার দেশে ফিরবার ব্যবস্থা করা যাবে।

—শেষ-